অন্তর ও বাহির

সুবোধচন্দ্র মজুমদার

জিজ্ঞাসা
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৯

অন্তর ও বাহির

প্রকাশক

কালিদাস ঘোষ

জিজ্ঞাসা

১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ

কলিকাতা-২৯

প্রচ্ছদপট

রমেন কুণ্ড

মুদ্রাকর—শ্রীশান্তিরঞ্জন দে

শ্রীলছমী প্রেস

৫৬।৩ নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৬

১৩৫৭ বংগাব্দ

এক

মহাকাল পারাবারের তরংগবিক্ষুব্ধ বিশাল বক্ষে অন্তহীন মহাপথের চিরপথিক। কোন্ এক আনন্দময় মহাতীর্থের সন্ধানে নিরন্তর পরিভ্রমণ করি ধরিত্রীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। এমনি করেই হয়তো অকস্মাৎ একদিন সমাপ্ত হয়ে যাবে আমার সীমাহীন মহাজীবন প্রবাহের বর্তমান ছন্নছাড়া সর্বহারা অধ্যায়টা। এখনই যদি সমাজ ও স্বজনের কাছে স্বীকার না করে যাই আমার জীবনের পরম সত্যটি তাহলে আর হয়তো করাই হবে না কোনদিন। সত্যটি হচ্ছে ব্যবধান—অন্তর ও বাহিরের ব্যবধান। সর্বজনের দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর ও বাহিরের মধ্যে ঘটে চলে একটা ব্যবধান। আত্মবিশ্লেষণ ও সহানুভূতির দ্বারা মানুষ যদি ঘোচাতে সমর্থ হয় এ ব্যবধানটুকু তাহলে প্রভূত উপকার হবে সমাজের। মানবের দুঃখ তো আর কিছুই নয় অন্তর ও বাহিরের এ ব্যবধানটুকু ছাড়া।

সবাই বলে আমি খুব মনে রাখতে পারি, খুব মনে করতে পারি। তবু আমার জন্মদিনটা কিন্তু কিছুতেই পারি নে মনে করতে। মনে হয় চিরদিনই আছি, নূতন ক'রে আবার জন্ম হবে কেন? মনে পড়ে দিদিরা আমাকে হাটা শেখাতেন,

কথা শেখাতেন। দিদিদের সংগে আমি হাটতাম, কথা বলতাম। তখন নাকি আমার বয়স হয়েছিল দশমাস। অত অল্পবয়সে কথা বলতে শিখেও আমি কিন্তু আমার বাবাকে ডাকতাম না বাবা ব'লে। বড় লজ্জা করত আমার।

নিশ্চুপ নিঝুম দুপুরবেলা। বর্ষার জলে থই থই করছিল মাঠ খাট বাট সব। সামন্তপুরের বাড়ীগুলি দেখাচ্ছিল একএকটি দ্বীপের মতো। বাবা গেছিলেন এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে। মা বসেছিলেন পাড়ার মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে। পিসীমা বসেছিলেন নিরামিষ ঘরে খেতে। এ সুবর্ণ সুযোগে আমি গেলাম পুকুরঘাটে খেলতে। পাড়ের কাছেই ভাসছিল একটা কলাগাছের ভেলা। লাফ দিয়ে উঠতেই সেটা ধাক্কা খেয়ে ভেসে চলল মাঝপুকুরে। এমন সময় পিসীমা বাসন মাজতে ঘাটে এসে আমাকে দেখে চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলেন। মা এসে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রতিবেশীরাও এসে একত্র হলেন পুকুরের চার ধারে। কিন্তু কেউ কিছু করতে সাহস করলেন না। আমার বয়স মাত্র চার বছর, সাঁতার জানি নে, ধরতে গেলে পালাবার জন্য হয়তো মাঝপুকুরেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। শেষে বাবা এসে আমাকে তুলে নিয়ে পিসীমার কোলে দিতেই পিসীমা আমাকে নিয়ে গিয়ে রামকৃষ্ণদেবের মূর্তির পায়ের তলায় উৎসর্গ করলেন। তারপর থেকে ফি বছর এ দিনটিতে তিনি উপোস ক'রে রামকৃষ্ণদেবের পূজা করতেন।

পিসীমা ছিলেন বাবার চেয়েও বয়সে অনেক বড়। অতি অল্পবয়সে বিধবা হয়ে তিনি আমাদের সংসারে আসেন।

আপন সম্পত্তি সবটুকু নিঃশেষে ব্যয় ক'রে নিঃস্ব ছোটভাইকে সংসারে দাঁড় করান। নিঃসন্তান পিসীমাই ছিলেন আমাদের বাড়ীর অভিভাবিকা। প্রাণাধিক ভালবাসায় ভাইয়ের সন্তানদের লালন পালন করতেন। বিশেষ ক'রে আমি ছিলাম তাঁর নয়নের মণি।

মরণের মুখ থেকে ফিরে এসে আত্মীয় পর সবার কাছেই আমার আদর বেড়ে গেল। কোনো না কোনো বাড়ী থেকে প্রতিদিনই নিমন্ত্রণ পেতে লাগলাম। পল্লীগ্রামের এটাই রীতি। এখানে লোকসংখ্যা কম। সামান্য একটুকু জায়গাতে অনেক লোক বাস করে না গা ঘেষাঘেষি ক'রে। লোকারণ্যে কেউ হারিয়ে ফেলে না নিজেকে। সবাই সবাইকে চেনে। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকে অনুভব করে একটা অন্তরের দায়িত্ব। একজনের বিপদে আর একজনও বোধ করে অস্বস্তি। আমার পরিত্রাণে সবাই ফেলেছিল মুক্তির নিঃশ্বাস।

বল্লালসেনের সামন্তরা থাকতেন ব'লে আমাদের গ্রামের নাম হয়েছিল সামন্তপুর। আগের দিনের হাতী ঘোড়া, দালান কোঠা, আড়ম্বর আয়োজন কিছুই ছিল না এখন। কিন্তু মানুষের তৈরী জাঁকজমক মুছে গেলেও, বিশ্বমায়ের স্নেহের দান ছিল আগেরই মতো অকুণ্ঠ। গাঁয়ের পাশটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আজও বয়ে যেত ঊর্মিমুখরা ধলেশ্বরীর রূপালী স্রোতধারা। মাঠে মাঠে শীষ হেলিয়ে গা দুলিয়ে আজও খেলা করত শ্যামল শস্যরাশি! সবুজ মায়ায় ভরা আম বাগানের শাখায় শাখায় নেচে নেচে গান করত কতনা বিচিত্র রংএর পাখী। গরু নাওয়াতে নদীর জলে নেমে রাখাল

ছেলেরা বিভোর হয়ে থাকত নিজেদের 'নলডুবানি' খেলা নিয়ে। আলোছায়ায় ঘেরা অপরাহ্নে পল্লীবধূরা জল নিতে এসে প্রাণ খুলে গল্প করত নদীর ঘাটে ব'সে ব'সে। রং বেরংএর পাল তুলে দূরপথগামী মাঝিরা ভাটিয়ালী গান গেয়ে যেত দাঁড় ফেলার তালে তালে।

চার পাঁচখানা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে আমাদের গ্রামখানি অবস্থিত। সবারই বিদ্যালয়, অধ্যয়নাগার, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হাসপাতাল, ষ্টীমার ষ্টেশন, ডাকঘর, বাজার, খেলার মাঠ প্রভৃতি আমাদের গ্রামে অবস্থিত। আমাদের গ্রামের অকুণ্ঠ চেষ্টা ও পাশের গ্রামকয়টির আন্তরিক সহযোগিতা মিলে গড়ে তুলেছিল সামন্তপুর বিদ্যালয়ের অসাধারণ সমৃদ্ধি ও সুখ্যাতিকে। বিদ্যালয়ের রত্ন ব'লে যে-ছেলেটিকে অভিহিত করা হ'ত তিনি ছিলেন আমার বড়দা। সবাই বলত সন্দীপ শুধু রায়েদের বাড়ীর দারিদ্র্যই ঘোচাবে না, সমস্ত গ্রামেরও মুখ উজ্জ্বল করবে। অনেকে বলত, এমন মায়ের এমন ছেলে হবে না তো হবে কার? আমি ভাবতাম বড়দার মতো হওয়াটাই হ'ল সবচেয়ে বড় হওয়া। কিন্তু বড়দা সবাইকে বলতেন, সমীর হবে আমার চেয়েও অনেক বড়। আমাকে বড় করার জন্য বড়দার কি অক্লান্ত চেষ্টা। একদিনে আমাকে বর্ণপরিচয় শেখালেন, একদিনে ঘড়ি দেখতে শেখালেন, একদিনে সাঁতার কাটতে শেখালেন. একদিনে নৌকা বাইতে শেখালেন, একদিনে নারকেল গাছে উঠতে শেখালেন। অবশেষে সকলের মতের বিরুদ্ধে মাত্র পাঁচ বছর বয়সে আমাকে সামন্তপুর হাইস্কুলের ক্লাস থ্রীতে ভর্তি ক'রে দিলেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে বড়দা চলে গেলেন কলকাতায় কলেজে পড়তে। আমাকে ব'লে গেলেন, খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবি, লেখাপড়ায় বড় হওয়টাই আসল্ বড় হওয়া, টাকাপয়সায় বড় হওয়াটা কিছুই নয়। কত শুনতাম এরকম কথা, কত ভুলতাম। কিন্তু বড়দার কথা কিছুতেই পারতাম না ভুলতে। তিনি বলতেনও যা, করতনেও তা। সত্যনিষ্ঠ কৃতকর্মা মানুষকে না মেনে পারে না কেউ। তিনি অপরিচিত হলেও কিক'রে যেন লোকে বুঝতে পারে তাঁর কথা মামুলী কথা নয়, সত্যিকার জোর আছে এর পেছনে। একদিন খুব অন্ধকার রাত্রে বড়দা আমাকে বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে একটা চিঠি দিয়ে আসতে। বন্ধুর বাড়ীর পথটা ছিল জংগলের ভিতর দিয়ে। একা একা যেতে ভয় করছিল আমার। তবু গেলাম সেখানে। ফিরে আসতেই বড়দা জিগগেস করলেন, ওরা তোকে আলো দিতে চাইলে, তুই আনলি নে কেন? আমি বললাম, দরকার হলে তো তুমিই আমার সংগে দিয়ে দিতে, কিন্তু তুমি জানলে কীক'রে? তিনি বললেন, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ছিলাম তোর সংগে, ভয় করেছিল তোর? কোনো উত্তর না দিয়ে আমি চুপ ক'রে রইলাম। তখন বড়দা বললেন, জীবনে ভয় করবিনে কাউকে, যদি করিস্ তো মানুষকেই করবি, ভূতকে নয়। আর একদিন পাড়ারই এক বাড়ীর টেবিল থেকে একটা আনি চুরি করেছিলাম। মা আমাকে খুব মারলেন, তারপর মিথ্যে কথা বলার জন্ত সবার সামনে আমার মুখে গোবর ছুঁইয়ে দিলেন। রাত্রিতে বড়দা আমাকে তাঁর পড়ার ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন,

ছোট কাজকে ছোট জেনেও যে ছোট কাজ করে, চিরকাল ছোটই হয়ে থাকে সে। মানুষে তাকে বড় বললেও নিজের ছোটতা মনে মনে জেনে নিজের কাছে সে ছোটই হয়ে থাকে। কখ্খনও চুরি করবি নে, মিথ্যে কথা বলবি নে, আর খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করবি।

কিন্তু যে-কারণে খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম সেটা ছিল আরও গুরুতর। কিছুকাল থেকেই বড়দার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। পৃথিবীতে আমার যতকিছু কাম্য বস্তু ছিল তার মধ্যে একটি ছিল বৌদি। আমি কেবলি ভাবতাম বৌদিটির কথা—বৌদিকে আমি কি ব'লে ডাকব, বৌদি আমাকে কি ব'লে ডাকবেন, আমরা কি কি গল্প করব এসব। একদিন বড়দি আমাকে জিগগেস করলেন, বৌদি তোকে কী ব'লে ডাকবে? আমি বললাম, ঠাকুরপো ব'লে! পিসীমা ব'লে উঠলেন, লেখপড়া না শিখলে তোকে ঠাকুরপো তো ডাকবেই না, তার চাকর হয়ে থাকতে হবে তোকে সারা জন্ম।

বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেল। কিন্তু বড়দার নয়, বড়দির। কথাটা ভাল লাগল না আমার! বড়দি আমাকে নাওয়াতেন, খাওয়াতেন, কাপড় জামা পরিয়ে দিতেন। বই পড়াতেন, গল্প শোনাতেন, ঘুম পাড়াতেন। ভাবতেও পারতাম না বড়দিকে ছেড়ে থাকার কথা।

বিয়ের দিন নূতন জামাইকে দেখে আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। দুপুররাত্রে অন্যান্য বহু লোকের সংগে আমিও দেখছিলাম জামাইবাবুকে। জামাইবাবুর আদর আপ্যায়ন দেখে বিস্ময় আর

বাধ মানছিল না আমার—জামাই হওয়ার চেয়ে বড় সৌভাগ্য যেন আর কিছু নেই এ পৃথিবীতে। একবার ভাবলাম মাকে গিয়ে জিগগেস ক'রে আসি আমি কোনদিন পারব কিনা জামাই হতে। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটে আমাকে যেন অপরাধী ক'রে দিল সবার কাছে। বিয়ের দিন অল্পবয়স্ক শ্যালক শ্যালিকাদের মধ্যে একজন খেতে বসে নূতন জামাইর সংগে, আমারই ডাক পড়ল সে গৌরবময় কার্যটির জন্য। জীবনটা যেন সার্থক হয়ে গেল এমনভাবে ছুটে চললাম জামাইবাবুর দিকে। কর্ত্রীস্থানীয়া কয়েকটি প্রতিবেশিনীর চাপা হুংকার, কোথাকার বেহায়া রে তুই, তোর এ ছুরৎ নিয়ে লজ্জা করে না ভদ্রলোকের সংগে খেতে বসতে?

সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে এলাম নির্জন অন্ধকার পথে। এ পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু মানুষ। মানুষের মতো এত সুন্দরও আমার কাছে কেউ লাগে না, এত ভালও আমি কাউকে বাসতে পারি নে। মেঘ চাঁদ সাগর পাহাড় ফুল ছবি কিছুই আমার কাছে লাগে না মানুষের মতো মনোরম। সে মানুষই আমাকে ঠেলে দিল নির্জন অন্ধকারের মধ্যে।

জংগলাকীর্ণ পথটা দিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে বসলাম শ্মশানখোলার ভয়ংকর অশ্বত্থ গাছটার নীচের বেদীটার উপর। রাত্রে এদিকে আসত না কেউ। ছেলেপিলেরা তো আসত না দিনেরবেলাও। কয়েকজন লোক ইতিপূর্বে ভয় পেয়ে মারাও গিয়েছিল এখানে। কিন্তু আমার আজ মৃত্যুভয় ছিল না। কিসের আশায় কার জন্য আমি বাঁচব? আমার চেহারাটা তো আর সুন্দর হবে না। হলেও বা তার স্থায়িত্ব কোথায়?

কাকীমাও তো ছিলেন কত সুন্দর, কিন্তু কয়দিনের বসন্ত রোগে হয়ে গেলেন চিরতরে কুশ্রী! আমাকে যিনি বানিয়েছেন আমি আজ তাঁরই কাছে নিবেদন করব নিজেকে।

অন্ধকারটা হয়ে উঠল আরও কালো, আরও ভারি। ডালগুলির ফাঁকে ফাঁকে কারা ফেলতে লাগল বুকভাংগা দীর্ঘশ্বাস। শ্মশানটাতে দীপের মতো কী একটা জ্বলে উঠল, আবার নিবে গেল। একটা হাত এসে আমার মাথায় লাগল। মুখ তুলতেই ছট্‌ছট্‌ ক'রে কে যেন উঠে গেল গাছের ডগায়।

পরদিন সকালে আমার চেতনা ফিরে এল আমাদের বাড়ীতে পিসীমার কোলে। খানিকক্ষণ পরেই বড়দি চলে গেলেন শ্বশুরবাড়ী। চারদিক আঁধার হয়ে গেল আমার।

দিনের পর দিন যায়, আমার দিন যেন আর কাটে না। বড়দির কথা জিগগেস ক'রে ক'রে হয়রাণ ক'রে ফেলেছি মানুষকে। এখন আর আমার কথার জবাব কেউ দেয় না, বিরক্ত হয়ে ওঠে। বড়দির বাড়ী পালিয়ে যাব ভাবি, যেতে জানি নে। রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে কত বলি বড়দিকে এনে দিতে কিন্তু তিনি শোনেন না।

আমাদের বাড়ীতে কোনো ভাল খাবার জিনিস কিনতে দেখতাম না। একদিন বাজার থেকে দুধ ও ভাল ভাল তরকারি আসতে দেখে আমি বিস্মিত হয়ে মায়ের দিকে তাকালাম। মা বললেন, তোর দিদি আর জামাইবাবু আসবে আজ, কাল ভাইফোঁটা।

অন্যান্য বাড়ীতে জামাই এলে কত ভাল মাছ আনে তারা, কিন্তু আমাদের বাড়ীতে আনা হয়নি কিছুই। জংগলের ধারে ছিল

একটা এঁদো পুকুর। অনেক কই শিং মাগুর মাছ ছিল তাতে। তবু কেউ ওটার জলে নামত না নিউমোনিয়ার ভয়ে। ধারেও আসত না সাপের ভয়ে। গোপনে ওখানে নেমে অনেকগুলি মাছ ধরে বাড়ীতে নিয়ে দিলাম। তারপর চলে গেলাম নদীর ঘাটে বড়দিকে সবার আগে দেখতে।

লাল নীল শাদা হলুদ কত রংএর পাল তুলে কত নৌকা চলেছে নদীপথে। দুষ্টু পাখীরা মাঝ নদীতে উড়ে গিয়ে খেলা করছে পালগুলির সংগে। মাঝিরা বোঠে বায়, আর গলা ছেড়ে পরাণ খুলে গান গায়—এই না গাংগের আগের বাঁকে আমার বন্ধুর দেশ! কলসী কাঁখে চাষীমেয়েরা শোনে, আর হাসে সেদিক পানে চেয়ে চেয়ে। একটা আনন্দে নেচে ওঠে আমার বুকের ভিতরটা। আপন মনে বলতে থাকি, ভগবান, এই সামনের নৌকাটাতেই যেন থাকে বড়দি!

ধপাস্ ক'রে খানিকটা পাড় ভেংগে পড়ল নদীর মধ্যে। ভয়ে আঁৎকে উঠল আমার মনটা। একটু একটু ক'রে ভাংগতে ভাংগতে আমাদের গ্রামটাও যদি যায় ভেংগে! তাহলে আমাদের জীবন কাটবে কী ক'রে? এখানকার জল মাটি ঘাস পশু পাখী মানুষ, এখানকার আকাশ বাতাস সকাল সন্ধ্যা চাঁদ তারা যে মায়ার পরশ বুলিয়ে দেয় দেহে আর মনে। সর্বনাশী নদীটাও যে তার স্রোতের টানে আমার মনটাকে নিয়ে যায় কোন্ অজানার পানে নিরুদ্দেশের সন্ধানে! মাঝ দরিয়া থেকে ভেসে এল একটা করুণ তান,—

"তুমি যখন ভাংগ, নদী, ভাংগ একই ধার।
মন যখন ভাংগে, ভাংগে রে দুকূল তার।"

সত্যিই তো, নদী তো কখনও ভাংগে না এক সংগে দুই পাড়। তবে মানুষ কেন হয় এমন নির্মম? কেন আঘাত হেনে ভেংগে দেয় আর একজনের মনের সকল দিক? সবাই তো চায় আনন্দ পেতে আনন্দ দিতে, তবে কেন একজন নষ্ট করে আর একজনের আনন্দ?.........পেছন থেকে জড়িয়ে ধ'রে কে যেন কোলে টেনে নিল আমাকে। চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম বড়দি আর জামাইবাবু। তাঁদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল কে কার চেয়ে বেশী আদর করবে আমাকে।

পরদিন খুব সকাল থেকেই শুরু হয়ে গেল ভাইফোঁটার আয়োজন। সারা বছর বোন এ পুণ্য দিনটির পথ চেয়ে থাকে। চিরনূতন দিনের চিরনূতন পরিবেশে ভাই আসে বোনের পাশে, শুভক্ষণে বোন করে ভাইয়ের পরমায়ু কামনা। বড়দিও এসেছেন আমাকে ফোঁটা দিতে। আমার জ্ঞাতি বোনরাও বাপের বাড়ী এসেছেন ভাইফোঁটা উপলক্ষে। তাঁদের সহোদর নেই, তাঁরাও ফোঁটা দেবেন আমাকেই, পরমায়ু কামনা করবেন আমারই। বাপের বংশকে বাঁচিয়ে রাখতে মেয়েদের কী গভীর আকাংখা!

আমি একটা যে-সে লোক নই, দিদিরা আমার দয়াপ্রার্থী, ফোঁটা নিয়ে উদ্ধার ক'রে দেব তাঁদের, এমন একটা ভাব নিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। আজ সকল দিদিদের বাড়ীই আমার নিমন্ত্রণ। একএক বোনের বাড়ী যাই, তাঁর সমুখে নির্দিষ্ট আসনে শান্ত সুবোধের মতো বসি, বোন হাতদুখানি আমার মাথার উপরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধান দুর্বা ফুল বেলপাতা বর্ষণ করতে করতে বলেন 'যম দুয়ারে দিয়ে কাঁটা যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা, আমরা

দিই আমাদের ভাইকে ফোঁটা'। ব'লেই বাঁহাতের কড়ে আংগুল দিয়ে একটি চন্দন-তিলক এঁকে দেন আমার কপালে। তারপর আমার হাতে দেন অনেকগুলি নাড়ু মোয়া সন্দেশ। কিছু খেয়ে কিছু কোঁচড়ে নিয়ে আমি চলে যাই আর এক বোনের বাড়ী। সেখানে আবার আর এক বোন দেন আমার যমদুয়ারে কাঁটা।

পিসীমা আমাকে রামকৃষ্ণদেবের কাছে উৎসর্গ করলেও আমি ছিলাম পুরোপুরি নাস্তিক। ঠাকুর দেবতা ভূত পেত্নী মানা তো দূরের কথা, পিসীমার কাছ থেকে নাড়ু আদায় করার জন্য কতদিন যে তাঁর বিগ্রহশীলাটাকে জলের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছি তার ঠিক নেই আর। একমাত্র মিষ্টি প্রসাদ ছাড়া পূজা অর্চনা সবই নিরর্থক ছিল আমার কাছে। কিন্তু আজ যখন বোনেরা তাঁদের স্নেহসমুজ্জল শুভদৃষ্টি, আশিসপূত কল্যাণবাণী ও বিঘ্নসংহারী বাহুযুগল দ্বারা আমার জীবন থেকে সর্বপ্রকার অমংগলকে বিদূরীত করতে করতে বললেন 'যমদুয়ারে দিয়ে কাঁটা আমরা দিই আমাদের ভাইকে ফোঁটা' কোন্ এক অমৃতলোকের সন্ধান পেয়ে যেন আমিও উঠলাম অনুপ্রেরিত হয়ে, ভাবলাম আমি যে অজেয়, আমি যে অমর! যাদের বোন নেই, যারা ফোঁটা পায় না তাদের জন্য কেঁদে উঠল আমার প্রাণটা। বোনদের আশীর্বাদে আমি এগিয়ে চলব, সে অভাগারা তো পারবে না!

দুই

খুব দুষ্টু খারাপ একটা ছেলে এল আমাদের গ্রামে। মা নেই, বাপ নেই, থাকার কোন জায়গা নেই তাই এসেছে মামার বাড়ী থাকতে। লোকে নিতাইকে বলত লক্ষ্মীছাড়া অলক্ষুণে। আমাদের পুরোতঠাকুরই ছিলেন নিতাইর মামা। আমার চেয়ে বয়সে দুতিন বছরের বড় হলেও দেখতে তাকে আমারই মতো মনে হ'ত। স্কুলে পড়তও আমাদেরই ক্লাশে। নিতাইর মামীমা নিজেই পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বললেন নিতাই এতই খারাপ ছেলে যে তার সংগে যেছেলে মিশবে সেও খারাপ হয়ে যাবে। মিথ্যে কথা বলতে, পরের জিনিস চুরি করতে, অশ্লীল গালাগালি করতে নিতাইর জুড়ি যে কেউ ছিল না এটা আমরাও দেখলাম।

একদিন হেডমাষ্টারবাবু ছাত্রদের সুনীতি ও সততা শেখাবার ব্যবস্থা করলেন। আমাদের পাড়ার ছেলেরা পড়ল শিক্ষক অবিনাশবাবুর অধীনে। সোমবার দিন সকালে আমরা প্রত্যেকে একটুকরা ক'রে সুতা নিলাম। যখনই মিথ্যে কথা বলব তখনই একটা গেরো দেব তাতে। সপ্তাহের শেষে রবিবার অবিনাশবাবু গেরো গুনে দেখবেন আমরা কে কতটা মিথ্যে কথা বলেছি। যথাসময়ে সুতা ফেরত্ দিলাম। অধিকাংশ ছেলের সুতায়ই গেরো পড়ে নি একটাও, কারও কারও সুতায় দু'একটা পড়েছেও।

অবিনাশবাবু খুশী হলেন মিথ্যাবাদী ছেলেরা হঠাৎ সত্যবাদী হয়ে যাওয়ায়। কিন্তু ক্রুদ্ধ হতভম্ব হয়ে গেলেন নিতাইর কাণ্ড দেখে। গেরোতে ভর্তি পনের বিশটা সুতা সে বের ক'রে দিল পকেট থেকে। তারপর থেকেই মিথ্যেবাদী নিতাইর সংগে মেশাটা একরকম নিষিদ্ধ হয়ে গেল আমাদের কাছে।

নিতাইর আসার দিনটা আমি ভুলিনে বিশেষ একটা কারণে। নিতাইর সংগে গল্প ক'রে অনেক বেলায় বাড়ী ফিরতেই দেখলাম প্রতিবেশী মহিলাগণ আমাদের বাড়ীতে ভিড় করেছেন। একজন আমাকে বললেন, তোর একটি বোন হয়েছে, তোর মতো কুশ্রী বা দস্যি হবে না সে। নিতাই দেখে বললে, এত সুন্দর বোন কি আমাদের কপালে টিকবে?

বোনটি আমার সত্যি সত্যি খুব সুন্দর হয়েছিল। সবাই বলত পিসীমার সব রূপ নিয়ে জন্মেছে খুকু। বাইরের খেলাধূলা ছেড়ে দিয়ে আমি সারাক্ষণ ব'সে থাকতাম খুকুর পাশে। খুকু বড় হয়ে আমাকে 'মেজদা' ডাকবে শুনে আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলাম।

বেশ বড় হয়ে উঠল খুকু। অন্য সব বাড়ীতে ছোটদের জন্য কত খেলনা আসে। আমাদের বাড়ীতে এল না একটাও। শুনেছিলাম খারাপ সাপ ধ'রে থানায় দিলে সরকার আট আনার পয়সা দেয়। এক নিস্তব্ধ দুপুরে বঁড়শি আর ব্যাং হাতে নিতাইর সংগে বেড়িয়ে পড়লাম সাপ ধরতে। বড় বড় অনেক গোখ্রো সাপ ছিল ঘোষেদের বাঁশঝাড়ের গোড়ায়। বঁড়শির মধ্যে ব্যাংটা গেঁথে একটা গর্তের মধ্যে ফেলে দিয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলাম

রশিটা ধরে। অনেকক্ষণ বাদে টান পড়ল রশিতে। আমিও শুরু করলাম টানতে। কী জোর সাপের গায়ে! বেরিয়ে এল একটা বিরাট বিকট সাপ। ফনা তুলে ফোস্ ফোস্ গর্জন ক'রে তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগল আমার সমুখে, কোনো মতে মুখ থেকে বঁড়শিটা ছাড়াতে পারলেই ছোবল্ মারবে আমাকে। কিন্তু তার আগেই কোমরের মধ্যে একটা পাথর মেরে তাকে একেবারে কাবু ক'রে ফেললাম। তারপর নিয়ে চললাম থানায়।

পথের ধারে মেয়েরা পড়ছিল আনন্দঠাকুরাণীর পাঠশালায়। বড় সাধ জাগল ওদের ভয় দেখাতে। সাপটা নিয়ে পাঠশালায় ঢুকতেই মেয়েগুলি চীৎকার ক'রে উঠল 'বাবা রে' 'বাবা রে' বলে। লাফিয়ে লাফিয়ে পালিয়ে গেল জানালা দিয়ে। পাঠশালা ভেংগে যাওয়াতে আনন্দঠাকুরাণী রেগে মেগে মারতে এলেন আমাকে। নিতাই আগেই সরে পড়েছিল। আমি ছুটে পালিয়ে গিয়ে বনের ধারের বড় হিজল গাছটাতে উঠলাম।

এই বিশাল হিজলগাছটা ছিল পল্লীশিশুদের বংশানুক্রমিক মিলনপীঠ। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কিছু না কিছু ছেলে এখানে থাকতই। ডগা-রে-ডগা খেলা উপলক্ষে অবাধ লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করার এমন উপযোগী গাছ সারা সামন্তপুরে আর একটিও ছিল না। অকস্মাৎ এক ঝাঁক ভীমরুল এসে গাছটাতে বাসা বাঁধাতে আমাদের আনন্দের ভরা জোয়ারে ভাটা পড়ে গিয়েছিল। শুধু তাই নয় আমাদের মান-সম্মানও বিপন্ন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের পাড়ার ছেলেরা অতিশয় দুরন্ত বলে অন্য

সব পাড়ার ছেলেরা খুব সমীহ করত আমাদের। আজ সামান্য ভীমরুলের ভয়ে খেলা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে পাড়ায় পাড়ায় আমাদের নামে ছিছি পড়ে গিয়েছিল। তাই গতকাল বিকালে আমরা বেপরোয়া হয়ে মাঠের যত শুকনো খড় গাছটার নিচে জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম। সংগে সংগে ভীমরুলের চাকটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা গেল সব ভীমরুল মরে নি, যারা কোনও প্রকারে বেঁচে গিয়েছিল তারা এসে আবার বাসা বাঁধবার জন্য গাছটাতে বসে আছে। নামতে চাইলাম, নামবার উপায় নেই।

নীচে দিয়ে যাচ্ছিলেন অবিনাশবাবু তাঁর তৃতীয়পক্ষের স্ত্রীকে সংগে নিয়ে। আমাকে দেখে বললেন, নেমে আয় হতভাগা। আমি নামলাম না। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি হাতের লাঠিটা দিয়ে একটা খোঁচা দিলেন আমাকে। পাতার আড়ালে ছিল ভীমরুলের চাকটা, খোঁচাটা আমার গায়ে না লেগে লাগল গিয়ে সেই চাকটার মধ্যে। অমনি একটা ভীমরুল গিয়ে হুল ফুটালো তাঁর স্ত্রীর কপালে। তাঁরা ছুটে সরে পড়লেন। কিন্তু আমাকে একেবারে বেড়িয়ে ধরল সব ভীমরুল মিলে। হুল খেয়ে প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে অবশেষে একটা পুকুরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আত্মরক্ষা করলাম কোনোমতে। রাত্রে খুব জ্বর এল আমার।

পরদিন কাউকে কিছু না ব'লে জ্বর নিয়েই যথাসময়ে স্কুলে চলে এলাম। বিদ্যানুরাগের জন্যে নয়। এক ধনী জ্ঞাতির মায়ের শ্রাদ্ধে খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল, শনিবারের স্কুল ছুটি হওয়ার পর আমরা সবাই সেখানে খেতে যাব। দই ক্ষীর সন্দেশ রসগোল্লার

প্রচুর আয়োজন হয়েছিল। দই ক্ষীর প্রভৃতির উপর আমার খুব লোভ ছিল। সতেরো টাকা বেতনে চাকরি ক'রে বাবা পারতেন না দই ক্ষীর কিনতে। এরকম নিমন্ত্রণ উপলক্ষেই শুধু আমি পেট ভরে খেতে পেতাম এসব। কিন্তু জ্বর হয়েছে জানলে মা যেতে দেবেন না নিমন্ত্রণ খেতে। তাই শত যন্ত্রণা সত্বেও কাউকে বললাম না জ্বরের কথা।

ভীষণ খারাপ লাগল স্কুলে এসে। মাথা ছিঁড়ে পড়ে, বসতে পারি নে। চোখ ছল্‌ছল্‌ করে, চাইতে পারি নে। হুল ফুটানো জায়গাগুলি ব্যথায় টন্‌টন্‌ করে, আবার জ্বলেও যায়, হাত বুলাতে পারি নে। তবু চোখ নিচু ক'রে সহজভাবে ব'সে রইলাম জ্বর লুকোবার জন্যে।

অবিনাশবাবু এলেন ভূগোল পড়াতে। কাকে যেন বললেন, এই ভূতটা। জ্বর ধরা প'ড়ে যাবে ভয়ে আমি চোখ তুললাম না। আবার বললেন, এই ভূতটা। এবারও বুঝলাম না কাকে। পরমুহূর্তেই সপাং ক'রে এক ঘা চাবুক খেয়ে বুঝলাম আমিই অবিনাশবাবুর ভূতটা। উঠে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, পড়া শিখেছিস্-তুই ?

আমি বললাম, শিখেছি সার্।

তিনি বললেন, বল্ দেখি বাংলাদেশের সীমানা।

আমি বললাম, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বংগোপসাগর ......।

আবার আমার পিঠের মধ্যে আচম্‌কা এক ঘা চাবুক মেরে চীৎকার ক'রে অবিনাশবাবু বললেন, হতভাগা বইএ লেখা আছে 'সীমা—উত্তরে হিমালয়', আর তুই শুধু বলছিস্ 'উত্তরে হিমালয়'!

আমার মুখের কাছে তুলে ধরলেন বইটা। তারপর তাঁর চেয়ারের কাছে আমাকে টেনে নিয়ে সাঁই সাঁই ক'রে চাবুক মারতে লাগলেন। চাবুক ভেংগে গেলে কিল ঘুষি মারতে লাগলেন। মানুষের সামনে কাঁদতে লজ্জা করত আমার। ব্যথায় শেষ হয়েও কাঁদতে পারলাম না। এতে তাঁর জিদ চেপে গেল আমাকে কাঁদাতে। আর একটা চাবুক আনিয়ে নূতন ক'রে শুরু করলেন চাবকাতে। অস্থির হয়ে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম।

খবর পেয়ে পিসীমা এসে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন। আর অবিনাশবাবুকে অভিশাপ দিতে লাগলেন— বৌয়ের জন্য পাগল হয়ে তুই খুন করেছিস্ আমার মানিককে, নির্বংশ হবি, নির্বংশ হবি। আমার গায়ের রক্তমাখা কালো দাগগুলি দেখে মার চোখে পর্যন্ত জল এসে পড়ল। আমাদের ব্যথা দেখে মাকে কখনও বিচলিত হতে দেখিনি। দোষ করার জন্য আমাদের কেউ বকলে বা মারলে মা বরং খুশীই হতেন তাতে। অন্যান্য ছেলেরা পাড়ায় কোনো দুষ্টুমি করলে তাদের মায়েরা এসে দোষ ঢেকে বলতেন, আমার ছেলে জীবন গেলেও করবে না এমন কাজ। কিন্তু আমার মা আমি কোনো দোষ করলে তা জানা মাত্র যেচে গিয়ে ব'লে দিতেন সবাইকে, এজন্য অনেকসময় মনে হ'ত আমার যেন মা নেই। আমার সে কঠিন মাও আজ কাঁদতে লাগলেন আমার ঘাগুলি দেখে দেখে।

কয়েকদিন পর জ্বরটা ছেড়ে গেল। সকালবেলা মা ও দিদিরা আমার পাশে বসে গল্প করছিলেন। অদূরে বসে পিসীমা আমার পথ্যের আয়োজন করছিলেন আর বলছিলেন, রামকৃষ্ণঠাকুর

আমার মানিককে নিরাময় কর। আমি বললাম, তুমি আমার খাবারটা তাড়াতাড়ি কর। হঠাৎ পিসীমার করুণ কণ্ঠস্বর গগনভেদী ভয়ংকর হয়ে উঠল—আমার কুল যে খায় শীতলা-মা তাকে ধুয়ে নেবে, তার মা'র বুক খালি করবে, আসছে বছর এমন দিনে তার মা আর দেখতে পাবে না তার মুখ। নিতাই বলল, তোমার মুখে পোকা পড়বে বুড়ি। ক্ষিপ্ত হয়ে পিসীমা বললেন, আমার মুখে পোকা পড়বে কেন রে, তোর চৌদ্দপুরুষের মুখে পড়বে।

পিসীমার একটা খুব ভাল কুলগাছ ছিল। অনেক কুল ধরেছিল তাতে। কুলগুলি সবে পাকতে শুরু করেছিল। দু'একটা কুল মাত্র আমি খেয়েছিলাম, এমনসময়ে আমার হ'ল জ্বর। ভাল হয়ে উঠে আমি কুল খাব এ আশায় পিসীমা বাড়ীর কাউকে পাড়তে দিতেন না সে কুল। গাছের কুল থাকত গাছেই। এইমাত্র নিতাই এসে চুরি ক'রে খাচ্ছিল সে কুলগুলি।

নিতাই নিশ্চিন্তমনে কুল খেতে খেতে বলল, জিভটা তোমার খসে পড়বে, বুড়ি। পিসীমা চীৎকার ক'রে উঠলেন, ঠাকুর, ধম্ম, আমার কুল যে খায় সে আজই মরুক, মরুক, মরুক,। আমার সংযতভাষিণী মাও আর পারলেন না চুপ ক'রে থাকতে। বললেন, আমার ছেলেও তো খেয়েছে কুল, তবে সেই মরুক। আর যাও কোথা। নিতাইকে ছেড়ে দিয়ে পিসীমা এবার পড়লেন মাকে নিয়ে। দাঁত কিড়্মিড়্ করতে করতে মা'র দিকে এগিয়ে এসে বললেন, পোড়ারমুখী, আমাদের ছেলে মরবে কেন লা, তোর বাপের বাড়ীর ছেলেরা মরুক, তোর বাপের বংশ নির্ব্বংশ

হোক। দিদিরাও ভয়ে কেঁপে উঠলেন মা'র এমন সর্বনেশে কথা শুনে, বললেন, ছিঃ মা হয়ে কিকরে তুমি এমন কথাটা উচ্চারণ করতে পারলে, মা? ছোটবেলাতে আমার মনটা খুব ছোট ছিল, পরকে আমাদের জিনিস দিতে চাইতাম না। তবু আমার কিন্তু পিসীমার চেয়ে মাকেই ভাল লাগল। ভাবলাম, পিসীমা আমার প্রাণ বাঁচাতে নিজের জীবন দিতেও প্রস্তুত, তবে আর একজনের মরণের জন্য এরকম উৎসুক হয়ে ওঠেন কিকরে?

বিকালে আবার জ্বর এল আমার। সবার সংগে সংগে মাও কাঁপতে লাগলেন ভয়ে। রাত্রে আরও বেড়ে গেল জ্বর। দু'তিন দিনের মধ্যেই অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন ডাক্তার এসে বললেন আমার পরমায়ুর মিয়াদ আছে আর বড় জোর তিন ঘণ্টা। আমি নির্জীব হয়ে শুয়ে ছিলাম। সবার ধারণা আমি অচেতন। কিন্তু চেতনাটি ছিল আমার পুরোমাত্রায়ই। মা পিসীমা দিদিরা আমায় ঘিরে নিঃশব্দে কাঁদছিলেন। পাড়ার লোকেরা একজন দু'জন ক'রে আমায় শেষ দেখা দেখে যাচ্ছিল। নিতাইও এসে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে ছিল আমার শিয়রের কাছে। এমনসময় ঘরে ঢুকলেন আনন্দঠাকুরাণী। হাত পা নেড়ে ব্যস্তবাগীশের মতো বললেন, পাড়ার ছেলেপিলেদের ডেকে এনে হেঁসেলের ভাত তরকারিগুলি খেতে দাও।

সত্তর বৎসর বয়স্কা নিঃসন্তান বালবিধবা আনন্দঠাকুরাণী ছিলেন গ্রামের গেজেট। অপয়া ও দরিদ্র ব'লে কেউ তাকে পছন্দ করত না। স্বামী যৎসামান্য টাকা রেখে গেছিলেন,

চাষীদের কাছে তা লাগিয়ে কিছু সুদ পেতেন। দুপুরবেলা মেয়েদের একটা পাঠশালা করতেন ঘণ্টা দু'একের জন্য, তার থেকেও কিছু পেতেন মাসিক। চরকা দিয়ে সুতা কাটতেন। একটা গরুও পালতেন। এভাবে কোনোমতে তাঁর গ্রাসাচ্ছাদনটা চলে যেত। তাঁকে সাহায্য করবার কেউ ছিল না এ দুনিয়ায়। নিজের খুব দরকারী কাজটা ক'রে বাকী সময়টা তিনি সংবাদ দেওয়া নেওয়া করতেন। এ বাড়ীর কথা ওবাড়ী, ওবাড়ীর কথা সেবাড়ী নিয়ে বেড়াতেন। তাই তাঁর নাম হয়েছিল গেজেট। তাঁর মতো এমন নির্মম পাষাণ কেউ কখনও দেখে নি। কোনো শিশুর গায়ে ডাক্তার কাটা-ছেঁড়া করবে, কিন্তু তার মা ভয় পায় কাছে থাকতে। তখন আনন্দঠাকুরাণী এসে বসেন শিশুকে কোলে নিয়ে। কোনো তরুণীর অকাল-বৈধব্যের সংবাদ অথবা কোনো জননীর একমাত্র সন্তানের মৃত্যুর খবর এসেছে বিদেশ থেকে। কে শোনাবে তাকে এই নিষ্ঠুর বার্তা? ডাক আনন্দঠাকুরাণীকে। তিনি শান্তভাবে কাজটি সমাধা ক'রে পাশের বাড়ী গিয়ে তামাক খেতে বসতেন। মেয়েমানুষকে তামাক খেতে দেখে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখতাম আমরা।

আজও তিনি এসেছিলেন একটা দরকারী কাজ করতেই। আমি মরে গেলে হেঁসেলের ভাত তরকারি সব অশুচি হয়ে যাবে, কেউ খাবেও না, ছোঁবেও না, সুতরাং সময় থাকতে সদ্‌ব্যবহার করাই উচিত। কিন্তু অপয়া আনন্দঠাকুরাণীর মুখে এ অলক্ষুণে কথা শুনে মা পিসীমা দিদিদের ভয় আরও বেড়ে গেল।

আমার কিন্তু একটুও ভয় করল না। দুই চোখের কোণ দিয়ে ফুটে উঠল একটা আলোর পদ্ম। আমার ভিতর থেকে কে যেন অতি ধীরে ধীরে বলতে লাগল কত অবোধগম্য কথা,—

নদীর জল সাগরে যায়,
নদীর মরণ এ কী,
না, সূচনা তার নূতন জোয়ারের?
মানুষের আত্মা মেশে মহামানুষে,
বেদনার বিচিত্র হাহাকার ওঠে দিকে দিকে,
মরণের মহাযাত্রা এতো নয়,
এ যে নবজীবনের বন্দনা!

পিসীমা বাইরে চলে গেলেন। মরণের করাল কালো ছায়াতলে নিথর হয়ে ব'সে ব'সে পল গুনতে লাগল অন্য সবাই। একটু পরেই পিসীমা তাড়াহুড়া ক'রে ঘরে ফিরে কতগুলি ফুল বেলপাতা জল আমার মাথায় মুখে মাখতে মাখতে বললেন, রামকৃষ্ণঠাকুরের চরণামৃত প্রত্যক্ষ।

দেখতে দেখতে বার আনা কমে গেল আমার অসুখ। সবাই বিস্মিত হয়ে গেল। ডাক্তারও শুনে বিস্মিত হলেন। আমি খুব খুশী হলাম, কিন্তু তত বিস্মিত হলাম না। আমার মনে হয়েছিল পরমহংসদেবের আশীর্বাদের এটাই স্বাভাবিক ফল।

তিন

বড়দির বিয়ের পর থেকে আমরা সমবয়সী ছেলেমেয়েরা একটা খেলা খেলতাম তার নাম 'বিয়ে বিয়ে খেলা'। একটি ছেলেকে বিয়ে দিতাম একটি মেয়ের সংগে, অন্যসবাই হতাম দেবর, ভাশুর, শ্বশুর, ননদ, জা, শাশুড়ি, পুরুত, চাকর ইত্যাদি। জংগল থেকে ঘাস পাতা ফল ফুলাদি এনে সুড়কি চুন সহযোগে রান্না ক'রে নিমন্ত্রণও খাওয়ানো হত এ উপলক্ষে। একদিন আমি খেলার জায়গায় গিয়ে খুব রাগের সহিত সবাইকে বললাম, আমি আর খেলব না তোমাদের সংগে। উদ্‌বিগ্ন হয়ে হালদারমশাইর নাতনী হৈম জিগগেস করল, কেন? আমি বললাম, তোমরা আমাকে শুধু দেবর ভাশুর শ্বশুর এসব কর, একদিনও জামাই কর না কেন? নাকটা ঠোটটা কিরকম ঘুচিয়ে হৈম বলল, যে চেহারা তার আবার শখ দেখ না। রাগ আর সামলাতে পারলাম না। একটা লাঠি দিয়ে সমস্ত খেলার জিনিস ভেংগে চুরমার ক'রে সবাইকে মেরে ধরে তাড়িয়ে হাতের কাছে হৈমকে পেয়ে তার চুলের মুঠিটা ধ'রে ঝাঁকতে ঝাঁকতে বললাম, বিয়ে করবি আমাকে? ভয়ে ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে হৈম বলল, করব। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় চলে গেল আমার রাগ। বরপক্ষ থেকে নিতাই কন্যাপক্ষের মজিদের সংগে ঠিক করল কাল হৈম'র বিয়ে হবে আমার সংগে।

পরদিন সকালে লেখাপড়া সাংগ ক'রে একটা ফর্সা প্যান্ট পরে, জুতাটা তেলো মাথায় ঘসে আর একটু চকচকে করে মনের খুশিতে নাচতে নাচতে গিয়ে বসলাম বিয়ের আসনে। এমনসময় হৈম বলে উঠল, আমি করব না বিয়ে এ কালো দানবটাকে। ক্ষিপ্ত হয়ে কি একটা প্রলয়কাণ্ড করতে যাচ্ছিলাম, নিতাই এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, তুই থাম। তারপর হৈমকে বলল, কাকে বিয়ে করতে চাস্ তুই? হৈম বলল, তোকে। নিতাই বসে পড়ল বিয়ের আসনে। হৈম সেজেগুজে এসে বসল তার পাশে। পুরুত মন্ত্র পড়ল। শুভদৃষ্টির সময় এল। কাসর ঘণ্টা হুলুধ্বনি বেজে উঠল। নিতাই তাকাল হৈম'র ঘোমটা-ঢাকা মুখের দিকে। একজন তুলে ধরল ঘোমটাটা। আর অমনি আসন থেকে লাফিয়ে উঠে 'ওয়াক থু' 'ওয়াক থু' করে নিতাই বলল, আমি বিয়ে করব না এ পেত্নীটাকে। লাগল তুমুল ঝগড়া। হৈম, হৈম'র ভাই আর ওদের চাকর মজিদ একপক্ষে, আমি আর নিতাই একপক্ষে। হৈম যত কাঁদে, আমরা তত হাসি। মজিদ বলল, দেখে নেব। হৈম গিয়ে নালিশ করল ওর দাদুর কাছে।

গ্রামে এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে আমাদের পাড়ার সবার খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। আমিই শুধু গেলাম আমাদের বাড়ী থেকে। খাওয়ার শেষে খুব বড় বড় দুটো ক'রে সন্দেশ দেওয়া হ'ল। একটা সন্দেশ নিজে খেয়ে আর একটা লুকিয়ে আনছিলাম খুকুর জন্য। আমার ছোট বোন খুকু সন্দেশ খুব ভালবাসত। কিন্তু বৃদ্ধ হালদারমশাই দেখে ফেললেন আমার কাজটা। এসে বলে দিলেন আমার মাকে। কোনোরকম ছোটতা মা দেখতে পারতেন না।

ভাল কাজ হউক, মন্দ কাজ হউক, তার মধ্যে কোনো ক্ষুদ্র রুচির আভাস থাকলে মা তা একেবারেই অপছন্দ করতেন। বিশেষ ক'রে মিথ্যেকথা, হিংসা, হ্যাংলামোকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। একে তো নিমন্ত্রণ বাড়ীর সন্দেশ বাড়ী আনছিলাম, তাও আবার লুকিয়ে। ভয়ানক রাগ করলেন মা। একদিনের জন্য খাওয়া বন্ধ করলেন আমার।

মাসখানেক পরে আমার মা আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে বাজার থেকে মাছ আনতে বললেন। দুপয়সায় ভাল মাছ পাওয়া যায় না। সবাই মাছ কিনে নিলে পর যেসব খুব ছোট ছোট মাছ চুপড়ির তলায় পড়ে থাকে তাই আনব। সবার কেনা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় বাজারের এক ধারে বসে রইলাম। রোদে বসে বসে তপ্ত ক্লান্ত হয়ে উঠলাম তবু জেলের চারপাশের ভিড়টা কমল না। হালদারমশাইর মাছ কেনা যেন আর শেষ হতে চায় না। অবশেষে আমি উঠে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পেছন থেকে কট্ করে একটা চিমটি কেটে দিলাম হালদারমশাইকে। কেটেই দূরে সরে পড়লাম। উঃ করে চমকে উঠলেন হালদারমশাই, রেগে চাইতে লাগলেন এদিক ওদিক। অন্য লোকেরাও ছত্রভংগ হয়ে সবাই সবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

দুপয়সার মাছ কিনে আমি বাড়ী চলে এলাম। দেখলাম মজিদ আমার মাকে বলছে, আর কেউ দেখেনি জেঠিমা, শুধু আমিই গরুর আড়াল থেকে দেখেছি। আমাকে দেখেই মা জিগগেস করলেন, হালদারমশাইকে চিমটি কেটেছিস্ কেন? সংগে সংগে একটা কঞ্চি ভাংগলেন আমার পিঠের মধ্যে।

দশবার' দিন পরে নাইতে যাওয়ার সময় একটা ন্যাকড়াকে সরষের তেলে ভিজিয়ে রাখলাম। খাওয়ার পর দেখলাম অনেক পিঁপড়ে এসে জমেছে তার মধ্যে। মাঠে গরু ছেড়ে দিয়ে দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে মজিদ গাছের ছায়ায় ঘুমুচ্ছিল আরাম ক'রে। অসংখ্য পিঁপড়েসহ সে ন্যাকড়াটা আমি ফেললাম তার মুখের মধ্যে। মা-রে গেছি-রে বলে চীৎকার করে লাফাতে লাগল সে। সোরগোল পড়ে গেল চতুর্দিকে। মা আমার পিঠে তিনখানা সদ্যকাটা কঞ্চি ভেংগে সারাদিন সারারাত্রি তালাবন্ধ ক'রে রাখলেন আমাকে।

প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে আমি আর নিতাই গ্রামের ডোবা নালা জংগল থেকে কয়েক শ ব্যাং সংগ্রহ করলাম। তারপর খুব বড় দুটা নতুন ভাঁড়ের মধ্যে জল দিয়ে সেগুলি রেখে মুখ দুটা খুব ভাল করে বন্ধ করলাম। কয়েকদিন আগে হৈম'র বড় বোনের বিয়ে হয়েছিল দূরের এক গ্রামে। নিতাইকে চাকর সাজিয়ে ভাঁড় দুটা পাঠিয়ে দিলাম হৈম'র বোনের বাড়ী, সংগে হৈম'র মার নামে লিখে দিলাম একখানা চিঠি। নতুনবৌয়ের বাপের বাড়ী থেকে মিষ্টি পেয়ে হৈম'র বোনের শাশুড়ি খুব খুশী হয়ে ভাঁড় দুটাকে নিয়ে ঠাকুরঘরে রাখলেন। কিছুক্ষণ পর খেতে দেওয়ার সময় ভাঁড় দুটার মুখ খুলতেই শুরু হ'ল তাণ্ডব নৃত্য। ভয়ে চীৎকার করে উঠলেন মেয়েরা সবাই। ঠাকুর ঘর, খাওয়ার ঘর, বিছানা, টেবিল, আলমারি সর্বত্র কেবল ব্যাংএর নৃত্য। বাড়ীর মধ্যে হুলস্থূল আরম্ভ হয়ে গেল। নিতাইও চম্পট দিল। খবর শুনে হৈমদের বাড়ীর সবাই বিস্ময়ে রাগে মরতে লাগল কিন্তু কেউ ভাবতেও পারল না কার কাজ এটা।

হৈম'র উপরে আর রাগ রইল না আমার। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার খুব মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া শুরু করলাম। নিতাই একদিন বলল, অবিনাশবাবুকে জব্দ করতেই হবে। আমি বললাম, কেন? নিতাই বলল, ও-শালা তোকে মিছেমিছি মেরেছিল ক্লাশে। আমার একটুও রাগ ছিল না অবিনাশবাবুর উপর, বললাম, কাজ নেই। নিতাই বলল, তুই তো গাধা, আমি ওকে একটু হয়রাণ করবই। আমি বললাম কিক'রে? সে বলল, আমি ওর বাড়ীতে যাওয়ার সাঁকোটা ভেংগে রেখে এসেছি, জলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে ওকে। আমি বললাম, আরও কত লোকের কষ্ট হবে না এতে? সে বলল, ও-শালা তো আগে মজা বুঝুক, পরে ঠিক করব।

নিতাই বলল, অবিনাশবাবু এখন হৈমদের পড়াচ্ছে, আমি গিয়ে বলি 'আপনার ছেলের অসুখ বেড়েছে,' অমনি শালা ছুটে যাবে বিষ্টির মধ্যেই। আমি বললাম, মিথ্যে কথা বললে তোকে মারবে না? সে বলল, কত আর মারবে. মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল তার মধ্যেই চলে গেল হৈমদের বাড়ী। আমিও গেলাম তার সংগে। নিতাই গিয়ে বলতেই অবিনাশবাবু হন্তদন্ত হয়ে বারান্দায় এলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনার ছেলের খবর নিতাই জানবে কিক'রে? ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন, তুই চুপ কর, মিথ্যুক কোথাকার। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে গেলে তাঁর জ্বর হবে এ ভয়ে আমি ছুটে গিয়ে আমাদের বাড়ীর আলমারি থেকে অব্যবহৃত রেইনকোটটা এনে তাঁকে দিলাম।

খুব খুশী হয়ে অবিনাশবাবু রেইনকোটটা পরলেন। 'বাপরে বাপরে গেলামরে', ব'লে চীৎকার করে উঠলেন পরামাত্র। তাঁর লাফালাফি দাপাদাপি দেখে আমরাও চমকে গেলাম। তাঁর সংগে আমরাও খুলতে লাগলাম রেইনকোটের বোতামগুলি। বোলতার বাসা ছিল রেইনকোটটার মধ্যে। যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন তিনি। অন্যান্য লোকরাও এসে ভিড় করল আমাদের কাছে। সবাই করে দুঃখ, কিন্তু নিতাই যেন আর হাসি চাপতে পারে না। অবিনাশবাবু বললেন, সমীর ইচ্ছে করেই করেছে এ কাজ। শুনে হালদারমশাই ক্ষিপ্ত হয়ে খুব চাবকালেন আমাকে।

বাড়ী আসার পথে নিতাই বলল, আরো যাও ভালমানুষ সাজতে, এটা যে কলিকাল সেটা খেয়াল নেই। অবিনাশবাবুর উপর ভয়ানক রাগ হয়েছিল আমার। চুপ করে ভাবতে লাগলাম কিভাবে জব্দ করা যায় তাঁকে। নিতাই বলল, একটা কাজ করলে শালাকে রাগানো যায়, করবি? আমি কাজটা না জেনেই বললাম, করব। নিতাই বলল, ওর উপর হেডমাষ্টার ভার দিয়েছেন আমাদের স্বভাব ভাল করার। আমরা একটা খারাপ কথার ডিকশিনারি তৈরি করব। আমি একটা খাতার এক ধারে সব গালাগালি আর অন্য সব খারাপ কথাগুলি লিখব। তুই ক্লাশের ফার্ষ্ট বয়, খুব ভাল ইংরেজী জানিস, তুই সে কথাগুলির পাশে একটা ক'রে ইংরেজী শব্দ নিজে তৈরি করে লিখবি। তারপর আমি গিয়ে সেটাকে অবিনাশবাবুর পড়ার টেবিলে রেখে আসব।

অন্তর ও বাহির

যথাসময়ে একটা ডিকশনারি রচনা করলাম। নাম দিলাম স্ক্যাম্প্‌স্‌ ডিকশনারি। কিন্তু অবিনাশবাবুর টেবিলে রাখার আগেই সেটা একদিন পকেট থেকে প'ড়ে গিয়ে মা'র হাতে পড়ল। আমি পালিয়ে গেলাম বাড়ী থেকে। চাবুকও খেতে হবে, উপোসও করতে হবে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভয় করতে লাগল—মাকে আমার মুখ দেখাব কিকরে? না খেয়ে স্কুলে গেলাম। স্কুল থেকে গিয়ে জংগলের মধ্যে একা একা ব'সে রইলাম, ভাবলাম, আমি বাঁচব কিকরে?

ঘোর জংগলের মধ্যে একটা পুরানো কালের দেউল ছিল মাটির নীচে। খুব কম লোকেই জানত সেটার কথা। ভয়ে কেউ যেত না সে জনহীন জায়গাটাতে। ভগবানকে কত ডাকলাম আমাকে মেরে ফেলার জন্য। তারপর যে জায়গায় খুব সাপ বেশী সে জায়গায় গিয়ে ঘোরাঘুরি করলাম। জলের নিচে গিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে পড়ে রইলাম। কিন্তু প্রত্যেক বারই দম ফুরিয়ে আসামাত্র উঠে পড়লাম। দুতিনটা খারাপ গাছের পাতাও খেলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। অবশেষে পরদিন একটা লতা গলায় জড়িয়ে ফাঁসি দেব এমনসময়ে নিতাই এসে হাজির হল। বলল, কী হয়েছে রে তোর? তোদের বাড়ীর লোকেরা, পাড়ার লোকেরা তোকে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছে। আমি যে তন্ন তন্ন করে কত জায়গায় তোকে খুঁজেছি তার আর ঠিক নেই।

চার

সামন্তপুর হাইস্কুলে মহাধুমধাম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এসেছেন সামন্তপুরে। আমাদের স্কুল পরিদর্শন করতে আসবেন আজ। কখন অতর্কিতে এসে পড়বেন সে আশংকায় শিক্ষকরা খুব সতর্কতার সহিত পড়াচ্ছেন। ছাত্রদের মধ্যে একটা নবীন উৎসাহ, শিক্ষকদের মধ্যে একটা নবীন উদ্যম। সমস্ত স্কুলটা একেবারে মেতে উঠেছে।

ক্লাশে আমার বসার জায়গাটা ছিল জানালার গায়ে মাঠের ধারে। বিস্তীর্ণ শ্যামল প্রান্তর গিয়ে মিলেছে দিগন্তের নীলিমার অংকে। সসীম গিয়ে মিলেছে অসীমের সংগে। মাঠের মধ্যে ছুটাছুটি ক'রে খেলা করে গরু বাছুরগুলি। নিয়ম নেই, শৃংখলা নেই, যে যাকে পারছে গুঁতিয়ে যাচ্ছে একদিক থেকে। ক্লান্তিরও আভাস নেই, আনন্দেরও অভাব নেই। এই আপনহারা মুক্তি, এই অবাধ নির্মল আনন্দের মধ্যেও যেন সে অসীমেরই বার্তা। দেখে দেখে আর আশ মেটে না আমার।

আমাদের পাশের ঘরটাই ক্লাশ থ্রী। একদিন আমিও পড়তাম ক্লাশ থ্রীতে। আর আজ পড়ি আমি ক্লাশ সেভ্ন্-এ। ওদের দিকে চাইলেই কেমন একটা অহংকার হয় আমার মনে মনে। পণ্ডিতমশাই এসে ইংরেজী পড়াতে শুরু করলেন ওদের ক্লাশে।

ভয়ে শিউরে উঠলাম আমরা—এখনই যদি এসে পড়েন আচার্যদেব।

পণ্ডিতমশাই সর্বদাই ইংরেজী-জানাদের নিন্দা করতেন। বিদেশী ভাষা নিয়ে সময় নষ্ট করা অন্যায় মনে করতেন। নিজে কিন্তু সুবিধা পেলেই ব্যবহার করতেন ইংরেজী শব্দ, চাইতেন নিজেকে ইংরেজী-জানা বলেও চালিয়ে দিতে। তিনি Oldকে বলতেন ওল্‌ড্, **Hen**কে বলতেন হ্যান, **Lamp**কে বলতেন লে'ম্। সর্বদাই খোঁজ রাখতেন তাঁর বিশ্রামের সময় খুব নীচের ক্লাশের কোনো ইংরেজী শিক্ষক অনুপস্থিত আছেন কিনা। থাকলেই হেড্‌মাষ্টারবাবুর অনুমতি নিয়ে সে ক্লাশে গিয়ে ইংরেজী পড়াতে শুরু করতেন। পণ্ডিতমশাই বললেন, বল, ভগবান আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, **Dog has created us.** সমস্ত ছাত্রদের সে কি হাসির পাল্লা। ছাত্ররা যত হাসে পণ্ডিতমশাই ততই ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, মূর্খরা, চাবকিয়ে লাল ক'রে দেব। তবু হাসি থামে না। চাবুক মারলেন। তবু থামে না। অবশেষে হেডমাষ্টারবাবু এসে তাঁকে নিয়ে গেলেন।

আমাদের ক্লাশে পড়াচ্ছিলেন সারদাবাবু। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পড়াতে পড়াতে অন্যমনা হয়ে তিনি বিবৃত করছিলেন নিজের ইতিহাসটা। কত উচ্চাংগের ক্রিকেট খেলোয়াড় ছিলেন তিনি, তাঁর ব্যাটিং দেখে খুশী হয়ে কোন্ মেমসাহেব নিজের গলার হার উপহার দিয়েছিলেন তাঁকে, কোন্ সাহেবের ইংরেজী উচ্চারণে ভুল ধরে সবাইকে তিনি তাজ্জব বানিয়ে দিয়েছিলেন, অভাবে অনটনে তাঁর সুশ্রী চেহারাটা কিভাবে হয়ে গেল কুশ্রী ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকবার শুনলেও আমরা তন্ময় হয়ে শুনতাম তাঁর কথা। সত্যনিষ্ঠ সদাচারী মানুষ। কখনও বা ব্রাহ্মণের অতীত গৌরবের কথা বলেন, আজ পর্যন্তও ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে যে নিজের ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুন্ন রেখেছেন সেজন্য অহংকার করেন, কখনও বা জাতীয় অধঃপতনের কথা ভেবে ইংরেজের প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন।

জানালার বাইরে চোখ পড়তেই দেখলাম একটা খোদাই ষাঁড় ক্ষেতের মধ্যে একজন কৃষক রমণীকে তাড়া করছে। কাউকে কিছু না বলে টুপ করে জানালা টপকে পড়ে ছুটে গিয়ে ষাঁড়টার ল্যাজটা ধরে হাতের মধ্যে প্যাঁচিয়ে ফেললাম। ল্যাজের মধ্যে ভার নিয়ে চলতে না পেরে প্রাণপণ জোরে সে ছাড়াতে চাইল আমাকে। শিংটা ঘুরিয়ে গুঁতাতে চেষ্টা করল। আমিও তার শিংএর দিকে ল্যাজটাকে ঘুরিয়ে টান মারলাম। সমুখ আর পেছন একই সময়ে একই দিকে ঘুরাতে পারে না কেউ। সে উল্টা দিকে শিংটা ঘুরাল। আমিও উল্টা দিকেই ল্যাজটা টানতে লাগলাম। বহুক্ষণ চলল এরকম ধ্বস্তাধ্বস্তি। অবশেষে প্রাণভয়ে ছুট দিল ষাঁড়টা। আমিও বাঁচলাম হাঁপ ছেড়ে।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। স্কুলের দিকে ফিরতেই সামনে যা দেখলাম তাতে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বহুলোক—শিক্ষক ছাত্র গ্রামবাসী সব—সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্কুলের পুকুরটার পাড়ে। ভরা দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুর মাথায় ক'রে তারা দেখছিল বৃষ-মানব সংগ্রাম। সবার আগে দাঁড়িয়ে সারদাবাবু আর হেডমাষ্টারবাবু চাবুক আস্ফালন ক'রে বলছিলেন,

স্কুল ভেংগে এরকম বিশৃংখলা সৃষ্টি করার উচিত সাজা দেব আজ। হেডমাষ্টার ধর্মশিক্ষার জন্য একটা সমিতি করেছিলেন, সেখানকার কথাবার্তা সব আমার কাছে আজগুবী মনে হ'ত বলে আমি যেতাম না সেখানে। এজন্য তিনি বিরক্ত ছিলেন আমার উপর। তাতে আবার আজকের এই ব্যাপার।

ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। আমার কানটা সজোরে ধরে হেডমাষ্টার সপাং সপাং চাবুক মারতে লাগলেন। এক দফা মেরে ক্লান্ত হয়ে একটু দম নিয়ে আবার শুরু করেছেন এমনসময় কে যেন পেছন থেকে আমার কাঁধের উপর হাত রাখতেই চাবুক সংযত ক'রে একেবারে নম্র নত হয়ে গেলেন। ঘনশ্মশ্রুবিভূষিত ঋষিপ্রতিম এক বৃদ্ধ আমার বুকে পিঠে চপেটাঘাত করতে করতে বললেন, এই তো চাই, বাংগালী ছেলের আজ এই তো চাই। সমগ্র জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল অমিত শক্তিধর সে বৃদ্ধপ্রবরের দিকে। পরক্ষণেই চিনতে পেরে প্রাণমন ঢেলে দিয়ে চীৎকার করতে লাগল—বন্দেমাতরম্, আচার্যদেব কী জয়। অপূর্ব এক অনুভূতিতে কেমন অভিভূত হয়ে গেলাম। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, ভারতের শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী, বাংগালী তরুণের স্বপ্নদেবতা, বড়দার মন্ত্রগুরু স্বয়ং আচার্যদেব স্পর্শ করলেন আমাকে, আশীর্বাদ করলেন আমাকে!

আবার ক্লাশ শুরু হ'ল। একান্ত নিষ্ঠার সহিত শিক্ষকরা পড়াতে শুরু করলেন। আচার্যদেব স্কুল পরিদর্শন আরম্ভ করলেন। অদম্য চাঞ্চল্যের সহিত ছাত্ররা সংকটময় মুহূর্তের অপেক্ষা করতে লাগল।

এবার এসে আচার্যদেব কাকে কী জিগ্‌গেস করবেন কে জানে। যদি তিনি আমার সম্বন্ধে আগের মতো ভাল ধারণা নিয়ে না যান? সম্মান ভালবাসা পাওয়া ভাল, না পাওয়াও একরকম, কিন্তু পেয়ে হারানোর মতো ভয়ংকর আর কিছু নেই। পাশের ক্লাশে আচার্যদেব আসতেই ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল আমার।

আমাদের ঘরে ঢুকেই আচার্যদেব আমাকে চিনতে পেরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। আমার বাংলা বইটা খুলতেই প্রথম যে গল্পটা বেরুল তার নাম 'প্রয়োজনই উদ্‌ভাবনের মূল'। আমাকে বললেন, গল্পটা আমাকে বল দেখি। আমি বললাম, লেখক বলতে চান মানুষে যে নূতন জিনিস বার করে তার মূলে আছে তার দরকারবোধ। আচার্যদেব বললেন, শুধু লেখক কেন, একথা তো সবাই বলে। আমি ভুলেই গেলাম কার সংগে কথা কইছি। বললাম, অনেক সময় একটা জিনিস আগেই কোনো কারণে বেরিয়ে যায়, তারপর মানুষে তা দেখে দেখে দরকারী মনে করে। বিস্মিত হয়ে তিনি বললেন, কীরকম? আমি বললাম, চা তো আমাদের এদিকে আগে কেউ খেত না, দরকারও বোধ করে নি, এখন ব্যবসায়ীরা এনে আমাদের দেখাতে দেখাতে দরকারী ভাবতে শিখিয়েছে। আচার্যদেব একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, তোমার নাম কী, খোকা? আমি বললাম, সমীরকুমার রায়। তিনি বললেন, সমীর! সন্দীপ তোমার কী হয়? আমি বললাম, দাদা। সস্নেহ আশীর্বাদের স্বরে তিনি বললেন, যেমন দাদা

তেমন ভাই। দাদা তো এম. এসসি.-তে ফার্স্ট হয়েছেন, তুমি কী হবে?

স্কুল পরিদর্শন শেষ হলে খেলার মাঠে বিরাট সভা বসল। শত শত নরনারীর জয়ধ্বনির মধ্যে আচার্যদেব বক্তৃতা শুরু করলেন—দেশপূজ্য লালমোহন ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সার্ জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বংগবাণীর বরপুত্র স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ ভারতবাসীর আদিবাসভূমি বিক্রমপুর দেখার আকাংখা আমার মনে অনেকদিন থেকেই ছিল। আজ বিক্রমপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রাম সামন্তপুর এসে আমার সে আকাংখা পরিতৃপ্ত হ'ল। আজ আমি এই মহতী জনসভায় দাঁড়িয়ে আপনাদের সমুখে দুটা কথা স্মরণ ক'রে তারপর অন্য কথা বলব। প্রথম কথা, বাংলার সংস্কৃতি ভাষাভিত্তিক। হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃষ্টান য়িহুদী যেধর্মের লোকই হউক না কেন, যে বংগভাষা বলে সে-ই বাংগালী। দ্বিতীয় কথা, ভারতের তথা বিশ্বের মুক্তি সংগ্রামে বাংগালীর একটা বিধি নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। আদর্শের জন্য সর্বস্ব বিসর্জন বাংগালীর মতো আর কেউ দিতে পারে না।

একটু জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছিল আচার্যদেবের আগমনোপলক্ষে। সন্ধ্যা হয়ে গেল সবার বিদায় নিতে নিতে। নিরালা কমনরুমটার একটা অন্ধকার কোণে স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে আমি ভাবছিলাম আচার্যদেবের কথা। রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের কথা। আচার্যদেব বাংগালীকে এঁদের মতো হতে বলেছেন। খুট্ করে একটা শব্দ হতেই

দরজার দিকে চেয়ে দেখলাম সারদাবাবু একটা ভাঁড় লুকিয়ে রেখে গেলেন বেঞ্চির আড়ালে। খুব আলোতে না বসলে দূর থেকে আমার মুখ দেখা যায় না। সারদাবাবুও দেখতে পেলেন না। ভাঁড়ের মুখটা খুলে দেখলাম তার মধ্যে আছে কয়েকখানা বিস্কুট, কয়েকটা কলা, কয়েক টুকরা আনারস। অত চাবুকেও কান্না আসে নি আমার, এখন ছলছল করে উঠল চোখ দুটা। কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল সারদাবাবুর। সাতাশ টাকা মাত্র বেতন পেয়ে তাদের ভাল বিস্কুট কিনে দেওয়া দূরে থাক, দুবেলা পেট ভ'রে ভাত দেওয়াই ছিল দুষ্কর। স্কুলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাদি করার ভার ছিল সারদাবাবুর উপর। উচ্ছিষ্ট খাবারগুলি ফেলে না দিয়ে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন ছেলেমেয়েদের জন্য। দিনের আলোতে নিতে লজ্জা করে তাই রাত্রিতে নেওয়ার ব্যবস্থা। কত দুঃখে যে এই গোঁড়া ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট জিনিসগুলি নিয়ে যাচ্ছেন নিজের ছেলেমেয়েদের খাওয়াতে ভেবে কান্না এল আমার।

লাইব্রেরী ঘরের আলমারির উপর উদ্বৃত্ত বিস্কুটগুলি রাখা হয়েছিল। আরও কয়েকটা বিস্কুট এনে রেখে দেব ভাঁড়টার মধ্যে যেন অন্তত একটি ক'রে জোটে প্রত্যেকের ভাগে, এই ভেবে চুপি চুপি গিয়ে মাত্র হাত দিয়েছি বিস্কুটের টিনে, পড়্ তো পড়্ সারদাবাবুর চোখেই পড়্। কান ধরে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গেলেন হেডমাষ্টারের কাছে। সবাই গালি দিলেন চোর ব'লে। হেডমাষ্টারবাবু কয়েক ঘা চাবুকও মারলেন। লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল। তবু কিছু বলতে পারলাম না।

পাঁচ

আমাদের বাড়ীর একটা ভয়ংকর দুঃসংবাদে সমস্ত সামন্তপুর গ্রামটা চঞ্চল হয়ে উঠল। মা বাবা পিসীমা দিদিদের সংগে সংগে আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে সমস্ত গ্রামবাসীরাই বিষণ্ণ ব্যথিত হয়ে গেল। বাবা মা পিসীমা এতকাল সর্বপ্রকার দারিদ্র্য ক্লেশ সহ্য করে এসেছিলেন একটি মাত্র আশার দীপ সমুখে রেখে— বড়দা চাকরি পেলেই শেষ হবে সব দুঃখের পালা। গ্রামবাসীরা দিন গুনছিল কবে সামন্তপুরের এই দীপ্তিময় সুসন্তানের যশোগানে মুখরিত হয়ে উঠবে সমগ্র বাংলাদেশ। এমন সময় খবর এল বড়দাকে গভর্ণমেণ্ট কারারুদ্ধ করেছেন বিপ্লবী সন্দেহে।

আমাদের সংসার ব্যবস্থাটা শিথিল হয়ে গেল। কোন কাজেই আর কারও কোনো উৎসাহ নেই। শেষপর্যন্ত সবারই রাগ পড়ল মা'র উপর। মা'র শিক্ষা দোষেই তাঁর সন্তানরা হয় এমন টাকাপয়সার প্রতি উদাসীন, দেশের কাজের জন্য পাগল। আর কারও ছেলে কি অতবড় চাকরির লোভ ছেড়ে যায় স্বদেশী ক'রে জেল খাটতে?

মেজাজও হয়ে গেল সবার খিটখিটে। সামান্য কারণেই উত্তেজিত হয়ে কলহে প্রবৃত্ত হয়। একদিন নিতাইর সংগে বাজি রেখে সোমেদের কুকুরটাকে জোর ক'রে গাছের উপর তুলতেই

সে খ্যাঁক ক'রে একটা কামড় দিল আমাকে। আমি লাফ দিয়ে পেছনে সরতেই আমার বাঁ পা-টা পড়ে গেল একটা জ্বলন্ত উনোনের মধ্যে। উঠে ছুটলাম, কিন্তু বেশীক্ষণ পারলাম না। চেতনা ফিরে এলে দেখলাম আমি সোমেদের পুকুরপাড়ে বড় বকুলগাছটার নীচে শুয়ে আছি। বহু লোক উপবিষ্ট আমাকে ঘিরে। কেউ বা পায়ে ওষুধ দিচ্ছে, কেউ বা মাথায় বাতাস করছে।

আমার মা প্রতিদিনের মতো আজও দরিদ্র মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। এমনসময় খবর পেলেন আমার পা পুড়ে গেছে। তিনি বকুলতলায় এসে দেখলেন প্রতিবেশীদের হাতে আমার শুশ্রূষা চলছে। সুতরাং আবার গিয়ে বসলেন বিনা বেতনের পাঠশালা নিয়ে। পিসীমা কিন্তু বরদাস্ত করতে পারলেন না মায়ের এই সহজ ব্যবহারটা। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো এই বিনেপয়সায় ছাত্র পড়ানোটা পিসীমা একেবারেই পছন্দ করতেন না। আজ আবার মা তাঁর তিনখানা মাত্র শাড়ী থেকে একখানা দিয়ে দিয়েছিলেন এক দরিদ্র মুসলমান রমনীকে। তারওপর পিসীমার নয়নের মণি আমার প্রতি এ উদাসীনতা। পিসীমা আর সামলাতে পারলেন না নিজেকে।

আমার মাকে পিসীমাই ঘরে এনেছিলেন বধূরূপে। নিজে অসাধারণ সুন্দরী হয়েও যে মা'র মতো রূপহীনাকে বরণ করে এনেছিলেন তার মূলে ছিল আমার দাদামশায়ের বংশগত কৌলিন্য। খুব বড় কুলিনের মেয়ে ঘরে এনেছেন ব'লে তিনি প্রথম প্রথম গর্ব করতেন খুব। ইংরেজী শিক্ষা একেবারে অপছন্দ করলেও মা যে ইংরেজী জানতেন সেজন্য কিন্তু একটু অহংকারও ছিল

পিসীমার মনে। তবু কিছুদিন যেতেই শিক্ষা ও কৌলিন্সের উপর পিসীমার সকল মোহ কেটে গেল। তাঁর সহস্র সদুপদেশ সত্ত্বেও মা লেখাপড়া ছাড়লেন না, প্রতিবেশীদের সংগে ঝগড়া করলেন না, ঘরের জিনিস পরকে দান করা বন্ধ করলেন না। তারওপর তাঁর ভাইয়ের অপরূপ বর্ণ সত্ত্বেও ভাইপো ভাইঝিরা, একমাত্র খুকু ছাড়া, কেউ হলো না ফর্সা। অতএব পিসীমার দুই চোখের বিষ হয়ে গিয়েছিলেন মা। রাত্রিতে বাবা বাড়ী ফেরা মাত্র পিসীমা সমস্ত কল্পনাশক্তি নিঃশেষ ক'রে তাঁর কাছে বললেন দুপুরের কাহিনীটা। বাবাও ক্রোধান্ধ হয়ে মা'র পিঠে বসিয়ে দিলেন দুই কিল।

এরকম দুঃসময়ের মধ্যে একদিন খুকুর হ'ল জ্বর। আংগুল দিয়ে নিজের কান দেখিয়ে দেয় আর চীৎকার করে কাঁদে। পয়সার অভাবে ডাক্তার ডাকা হ'ল না। প্রতিবেশীরা এসে টোটকা দিলেন। কিন্তু অসুখ সারল না তাতে। অবশেষে একটা থালা বিক্রী ক'রে ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার এসে দেখলে পর আমি গেলাম তাঁর সংগে ওষুধ আনতে। বাড়ী ফিরে দেখি খুকুকে কোলে নিয়ে উঠানে ব'সে মা কাঁদছেন 'মাগো মাগো' ব'লে, পিসীমা দিদিরাও কাঁদছেন সংগে সংগে।

উত্তরদিকের জংগলটাতে রাখা হ'ল খুকুকে। সকল দিক শূন্য হয়ে গেল আমার কাছে। সারাক্ষণ কেবল খুকুর কাপড় জামা খেলনা ছবিগুলি নেড়ে চেড়ে দেখতাম। দেখে দেখে আশ মিটত না আর। রাত্রে বিছানায় শুলে মনে হ'ত খুকু রইল বাইরে। নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতাম অন্ধকার জংগলের মধ্যে।

এদিক ওদিক খুঁজে বেড়াতাম শুধু একটি বার খুকুকে চোখের দেখা দেখার জন্য। যেখানে শুনতাম পরকালের কোন ব্যাপার আছে সেখানেই চলে যেতাম খুকুর খবর শোনার জন্য।

জীবনের অপরিহার্য পরিণতি মৃত্যু। সবাই একদিন মরবে। কারণ ছাড়া ফল নেই, ফল ছাড়া কারণ নেই। জীবন কারণ, মৃত্যু ফল। তবে মৃত্যুর ফল কী? বিজ্ঞান বলে 'হাঁ'র থেকে 'না' আসে, আবার 'না' ও 'হাঁ'র সমন্বয় থেকে আসে নূতন 'হাঁ'। সেরকম জীবন থেকে মৃত্যু আসে, এবং মৃত্যু ও জীবনের সমন্বয় থেকে আসে নূতন জীবন। মৃত্যুকে তাহলে ভয় করার কিছুই নেই। খুকুর আবার জন্ম হবে। কিন্তু আমি পাব কী ক'রে খুকুকে? আবার আকুলি বিকুলি করতে থাকে আমার প্রাণটা।

একদিন স্কুলে খবর পেলাম দু'ক্রোশ পশ্চিমে মালখানগর গ্রামে এক সাধক মৃত ব্যক্তির আত্মার সংগে কথা বলে। আমি অস্থির হয়ে উঠলাম খুকুর সংগে কথা বলার জন্য। স্কুল থেকে বেরিয়ে আর বাড়ী না গিয়ে সোজা চলে গেলাম সাধকের বাড়ী। সন্ধ্যা হয়ে গেছিল। রাত্রি আটটার সময় সাধকমহাশয় আসনে বসবেন। আমাকে খুব আদর আপ্যায়ন করলেন তিনি। অনেক কথা আমাকে বললেন, শুনলেনও অনেক কথা আমার কাছ থেকে। গুণী লোকের অমায়িক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

ধীরে ধীরে আরও অনেক ভক্ত এল। সাধকমহাশয় আসনে বসলেন। আধঘণ্টা সব চুপচাপ। তারপর সুর ক'রে ছন্দ মিলিয়ে এক এক ক'রে ডেকে কথা বলতে শুরু করলেন। ডাক শুনে ভক্তেরা একে একে গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে,

জবাব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসে। কথাবার্তাগুলি কেমন হেঁয়ালিতে ভরা। একসময় তিনি বললেন,—

পূবেতে আছে যে ভক্তের বাড়ী
মায়ের কাছে আসুক তাড়াতাড়ি।

সকলেই সকলের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কেউ বুঝতে পারে না সাধক কাকে ডাকছেন। আমাকে একজন জিগগেস করলে, তোমার বাড়ী কোন্‌দিকে খোকা? আমি বললাম, পূবদিকে। যারপরনাই উদ্‌গ্রীব হয়ে সে বলল, তবে চুপ ক'রে বসে আছ কেন, ঠাকুর ডাকছেন যে! আমি ব্যস্ত হয়ে উঠে গিয়ে মায়ের মন্দিরের কাছে দাঁড়াতেই সাধকঠাকুর বললেন,—

বিশ্বেশ্বরের লীলাভূমি মহাকাশী,
ভগিনী তোর আছে সেথায় তীর্থবাসী।

আবার চুপ। প্রশ্ন করলাম, খুকুর সংগে কথা বলতে পারব আমি? কোন উত্তর পেলাম না। খুব খারাপ লাগল আমার। কত কিছু জানব বলে এসেছিলাম—খুকু এখনও কান্নাকাটি করে কিনা আমার জন্য, আবার সে আসবে কিনা আমাদের কাছে। শেষ পর্যন্ত এই। বিরক্ত হয়ে চলে আসার আগে আর একটা কথা জিগগেস করলাম, আমি কী পরীক্ষায় পাশ করব এবার? আবার সাধকঠাকুর গেয়ে উঠলেন,—

মন দিয়ে করলে পড়াশুনা
তোকে ফেল করে কোন্‌জনা?

আমি ভাল করেই জানতাম তা। বললাম, মন দিয়ে পড়াশুনা করা হবে কিনা তাই তো জিগগেস করছি। সাধক জবাবে

দিলেন না। কিন্তু ভক্তরা সব মারমুখী হয়ে উঠল আমার উপর।

পথে বেরিয়ে ভয় হতে লাগল মাকে না জানিয়ে চলে এসেছি এত দূর, কত রাত্রি হবে ফিরতে। ঘোর অন্ধকার, তারওপর আকাশের অবস্থা খুব খারাপ। নদীর পাড়ের ভয়ংকর শ্মশানটার পাশ দিয়ে যেতে হবে। সেদিন একটা বাছুরকে ভূতে চাপর দিয়ে মেরে ফেলেছে ওখানে। তার কয়েক দিন আগে একটা ছেলের ঘাড়টা ভেংগে ফেলেছিল।

ধলেশ্বরীর তীর বেয়ে হন্‌হন্‌ করে ছুটতে লাগলাম। বৃষ্টি বাতাস বজ্র বিদ্যুৎ ভূমিকম্প মিলে ভীষণ দুর্যোগের সৃষ্টি হ'ল। নদীতে নৌকা ছিল না। মাঝিরা সব গ্রামে ছুটে গেছিল আশ্রয় নিতে। প্রাণপণ বেগে দৌড়াতে লাগলাম আমি। যত ছুটি, দুর্যোগও তত বাড়ে। জংগলের খোঁচা, ঠাণ্ডা বাতাস, জলের ঝাপটা, আগুনের ঝলকানি, বাজের কড়কড়ি, মাটির কাঁপুনি। জীবনসমাজকে বিধ্বস্ত বিলুপ্ত করে দেওয়ার এমন পরিপূর্ণ আয়োজন কেউ কখনও দেখে নি।

অনেকক্ষণ পর চোখে পড়ল আমাদের বাজার আর ষ্টীমার ষ্টেশনটা। ভয়ংকর বিপদের মধ্যেও একটু জল এল পরাণে। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম সেদিকে। একটা ভীষণ তীব্র বাজ পড়ার সংগে সংগে ঝড়টাও আচমকা বেড়ে উঠল। শূন্যের উপর দিয়ে চার পাঁচ হাত উড়িয়ে নিল আমাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করে ষ্টেশন ঘরটায় ঢুকলাম। অমনি আগুনে আগুনময় হয়ে গেল চারদিক, সংগে সংগেই কড়কড়াৎ শব্দে কানে তালা

লেগে গেল একেবারে। জীবন বাঁচাতে আরও ভিতরে ঢুকলাম ঘরটার। মর্মর্ পট্‌পট্‌ করে ভেংগে পড়ল সেটা। কোনোমতে বেরিয়ে এসেই আকাশের আলোতে দেখতে পেলাম ঘাটে বাঁধা ষ্টীমারটা রশি শিকল ছিঁড়ে উল্টে গিয়ে হু হু করে চলে গেল চড়ের দিকে। পশুপাখীর মরণ চীৎকার, নরনারীর অন্তিম আর্তনাদ, ঘর ভাংগার মট্‌মট্‌, গাছপালার ধুপধাপ! মরি বাঁচি করে আবার ছুটলাম বাড়ীর দিকে। আলোর ঝলকে দেখলাম দুজন মাঝিও বোঠে হাতে ছুটছে গাঁয়ের দিকে। ঘর পড়ার একটা কর্কশ আওয়াজ। কানের কাছে একটা শোঁ শব্দ। সংগে সংগেই আর্তনাদ—আল্লাহ্‌ খোদা ভগবান! আর এক ঝলক আলোতে দেখলাম একটা চালের টিন এসে দু'খণ্ড করে ফেলেছে মাঝি দু'জনকে।

বন্যায় ভাসা মাঠটা সাঁতরিয়ে গ্রামে এলাম। পথ বলে কিছু নেই। ঘর প'ড়ে, গাছ ভেংগে, জল উঠে, ভেসে ডুবে একাকার হয়ে গেছে সব। শীতে কাঁপতে কাঁপতে কী ভাবে এসে শেষরাত্রে পাড়ায় পৌঁছলাম তা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। সবার আগে আমাকে দেখতে পেল আমাদের কুকুর টম। সাতদিন মাত্র বয়সের সময় এক বন্ধুর কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলাম টমকে, তখন থেকে আমাদের বাড়ীতেই আছে। আজকের ভয়ংকর ঝড় তুফানের মধ্যেও আমার পথ চেয়ে সে বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমাকে পেয়ে আনন্দ আর ধরে না তার। ল্যাজ নাড়ে, আমার হাত পা চাটে, আবার গায়ে লাফিয়ে ওঠে।

বাড়ীতে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিয়ে মাকে ডাকলাম। সচকিত হয়ে মা দরজা খুলে আমাকে কোলে টেনে নিলেন। ঘরের কাণ্ড কারখানা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। মা'র চোখে জল। দিদিরা চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে কাঁদতে কাঁদতে। ছোট ভাই অধীর রাত জেগে বসে আছে আমাকে দেখার জন্যে। পিসীমা আচ্ছন্নের মত কেবল বলছেন, রামকৃষ্ণঠাকুর, রামকৃষ্ণঠাকুর! সবাই আমাকে ঘিরে বসল। আনন্দের দুঃখে কথা বলতে পারে না কেউ, সবার চোখে জল, কণ্ঠ রুদ্ধ। কেউ বা গায়ে মাথায় হাত বুলায়, কেউ বা পায়ে সেঁক দেয়, কেউ বা আমাকে গরম জামা পরিয়ে দেয়। কত যুগযুগান্ত পরে আবার এমন করে ফিরে পেলাম সবাইকে! প্রলয়ংকর বজ্রের তীব্র সংঘাত আর প্রাণঘাতী মহাতুফানের প্রবল আলোড়ন ব্যতীত যে হয় না প্রেমের সঞ্জীবন!

নিতাই কয়দিন কোথায় গিয়েছিল, শুনলাম আজ ফিরে এসেছে। মহাতুফান বা সাইক্লোনের অভিজ্ঞতাটা বীরত্বব্যাঞ্জকভাবে বর্ণনা করার জন্য আমি খুব গোপনে তার কাছে গেলাম। এটুকু বয়সের মধ্যেই অসৎ কর্ম ক'রে ক'রে এমন সুনাম অর্জন করেছিল সে যে কোনো অভিভাবকই চাইতেন না ছেলেপিলেরা তার সংগে মিশুক। অবশ্য আমার মা'র ঘৃণাটা তেমন উৎকট ছিল না তার উপর। মাঝে মাঝে খুব গোপনে তিনি বাড়ীতে ডেকে এনে তাকে খাওয়াতেনও।

জমিদারের বড়ছেলে নিতাইকে নির্মমভাবে চাবকাচ্ছিল। এটা নূতন কিছু নয়। এ পাড়ায় কোনো দুষ্কর্ম ঘটলেই বিনা

প্রমাণে শাস্তি দেওয়া হ'ত তাকে। তার মামা মামী আপত্তি করতেন না এতে। নিজেরা এত অত্যাচার করতেন তার উপর যে অন্যে অত্যাচার করলে আর বলতে পারতেন না কিছু। বরং খুশীই হতেন। চাবকানো থামলে নিতাই আমাকে দেখেই ব্যথা ও কান্না ভুলে সহজাত হাসিটি হাসতে হাসতে ছুটে চলে এল আমার কাছে। বলল, এবারও কিন্তু তোকে পরীক্ষায় ফাষ্ট হতেই হবে, আমি বাজি রেখেছি তুই আমাদের ক্লাশে ফাষ্ট না হলে আমি হাতে চুড়ি পরব। আমি বললাম, সেক্রেটারীর ভাইপো কার্তিক কলকাতার হেয়ার স্কুলের ফার্ষ্ট বয় ছিল, সে-ই এবার ফার্ষ্ট হবে আমাদের ক্লাশে। নিতাই বলল, সব ব্যাটাকে আমি বলে দিয়েছি ওসব হেয়ার-স্কুল ফেয়ার-স্কুল কলকাতার চালবাজী খাটবে না সামন্তপুরে। আমি বললাম, সেসব পরে হবে, তোমায় এমন ক'রে মারলে কেন তা বল। নিতাই বলল, একেবারে অমনি অমনি, কোন দোষ নেই আমার। কিন্তু তুমি করেছিলে কী? —জিগগেস করলাম আমি। নিতাই যা বলল তাতে বিস্ময়ের সীমা রইল না আমার। কায়াকে ছেড়ে ছায়ার পেছনে কতই না ঘুরতে পারে মানুষ!

কিছুদিন আগে জমিদারের ছোটছেলের খুব অসুখ করেছিল। নারায়ণ পূজার ব্যবস্থা হয়েছিল অসুখ সারবে ব'লে। নিতাইর মামা ছিলেন সেবাড়ীর পুরোত। ঝড়বাদলের জন্য তিনি বাড়ী ফিরতে পারেন নি পূজার দিন। এরকম অবস্থায় নিতাইই যেত পূজো করতে। যথাসময়ে শালগ্রামশিলার পিতলের বাক্সটা নিয়ে সে জমিদার বাড়ী চলল। পথটা ছিল জলে কাদায় একেবারে

পিছল। হঠাৎ সে পা পিছলে পড়ে গেল। বাক্সটাও পড়ে গেল তার হাত থেকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর সে বাক্সটা পেল, কিন্তু শিলাটির কোন সন্ধানই পেল না। অগত্যা দিশেহারা হয়ে এক মুদির দোকান থেকে একতাল কালো তামাক কিনে বাক্সের মধ্যে বসিয়ে পূজা সমাধা করে এল। কয়েকদিন পর অসুখ সেরে গেল। সে উপলক্ষে খুব বড় খাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল জমিদার বাড়ীতে। যথাসময়ে বহু নিমন্ত্রিত লোকের সংগে নিতাইও বসল খেতে। বন্ধুর আরোগ্যে মনের ফুর্তিতে পূজার ব্যাপারটা সবার কাছে প্রকাশ করে দিয়ে সে বলল, তামাকের মধ্যেও কিন্তু ভগবান আছেন। অমনি জমিদারের বড়ছেলে অভুক্ত নিতাইকে তুলে নিয়ে চাবকাতে শুরু করলেন। নিতাই কোনোমতে পালিয়ে তার পিসীর বাড়ী চলে গেল। আজ ফিরে আসা মাত্র আবার চাবকাল তাকে। নিতাই বলল, দেখ্ সমীর, আমি যত মিথ্যুকই হই নে কেন, তোর কাছে কক্ষণও মিথ্যে কথা বলি নে। পূজোর সময় আমি মনে মনে কত ডেকেছি ঠাকুরকে। যদি দোষই থাকবে আমার পূজোয়, তাহলে ঠাকুর সন্তুষ্ট হবেন কেন, আর অসুখই বা সারাবেন কেন?

সাইক্লোনের কথা আর বলা হ'ল না আমার। আমি চলে আসার সময় কেমন অসহায়ের মতো নিতাই বলল, সুমীর, আমার সংগে তুই আর মিশিস্ নে। আমার সংগে দেখলে লোকে তোকে খারাপ বলবে, মাষ্টাররা পরীক্ষায় কম নম্বর দেবে। ফাষ্ট কিন্তু তোকে হতেই হবে।

ছয়

অবশেষে নিতাইর মুখ রক্ষা হ'ল। কার্তিকের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেয়ে আমি প্রথম হয়ে উপরের ক্লাশে উঠলাম। তবু নিতাইর আর আকাংখার শেষ নেই। এসে বলল, অঙ্কে সেকেণ্ড হয়েছিস্ কেন, এখন আমি লোকের কাছে মুখ দেখাই কী ক'রে? সে নিজে যে ফেল করেছে তারজন্য একটু দুঃখও করল না।

আমার নম্বর দেখে স্কুলের মাষ্টাররা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে গেলেন। সবাই বলাবলি করতে লাগল তিন বছর পরে সামন্তপুর স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হবে। কিন্তু এদিকে নিতাইকে সামলানো দায় হয়ে উঠল আমার। কাছাকাছি মন্দির মসজিদ গির্জা যেকটা ছিল সবার মধ্যেই সে পূজা দিতে লাগল আমি প্রথম হয়েছি বলে। পূজার পয়সা যোগাড় করত সে জঘন্য জোচ্চুরি ক'রে।

একজনের গরু যাতে আর একজনের ক্ষেতের শষ্য না খায় সেজন্য খোঁয়াড় ছিল পল্লীগ্রামে। সরকারী লাইসেন্স্ নিয়ে একজন লোক বেড়ায়-ঘেরা একটা জায়গা রাখত কয়েদখানার মতো, তার নাম খোঁয়াড়। কারও ক্ষেতে অন্যের গরু ঢুকলে সে ঐ গরুটাকে দিয়ে আসত খোঁয়াড়ে। খোঁয়াড়ওলা পাঁচআনার পয়সা দিত তাকে। আবার গরুর মালিক আটআনার পয়সা

খোঁয়াড়ওলাকে দিয়ে ছাড়িয়ে নিত গরুটাকে। পথের গরুগুলিকে নিতাই গোপনে তাড়িয়ে নিয়ে যেত নিজেদের ক্ষেতে, তারপর সেগুলিকে ধরে দিয়ে আসত খোঁয়াড়ে। এরকম দুষ্কর্ম পূর্বে কেউ কখনও করেনি বলে কেউ সন্দেহ করত না তাকে।

একদিন নিতাই বলল, রামপাল যাবি? ইতিহাসখ্যাত বংগাধিপতি বল্লাল সেনের রাজধানী রামপাল আমাদের বাড়ী থেকে মাত্র আড়াই ক্রোশ। তবু আজ পর্য্যন্ত সে জায়গাটি দেখিনি আমি। এক কথায়ই রাজী হয়ে বললাম, যাব। পথে ঘাটে খালি হাতে যাওয়া উচিত নয় ভেবে অধীরের কাছে একটা পয়সা চাইলাম। অনেকদিন আগে মেলা উপলক্ষে অধীর একটা পয়সা পেয়েছিল, সেটা সে খরচ না করে জমিয়ে রেখে দিয়েছিল আমি তা জানতাম। পয়সাটা চাইতেই অধীর ইতস্ততঃ করতে লাগল। আমি বললাম, অমন সুন্দর জায়গা আর নেই, কত ভাল ভাল জিনিস পাওয়া যায় ওখানে, তোর জন্য কত জিনিস নিয়ে আসব আসার সময়। অমনি সে বলে বসল, তাহলে আমিও যাব তোমার সঙ্গে। উপায়ান্তর না দেখে বললাম, কী জংগল পথে, কত সাপ বাঘ ভূত পেত্নী থাকে সেখানে, কত অন্ধকার হয়ে যাবে আসতে, খুব ছোট ছেলে দেখলে আবার পুলিশেও ধরে নিয়ে যেতে পারে। আর কোন কথা না বলে অধীর ঘরের পেছনে ছাইয়ের গাদাতে লুকানো পয়সাটা বের করে এনে আমার হাতে দিল। ঠিক এমনসময় নিতাই এসে চুপি চুপি দাঁড়াল

সেখানে। বলল, মানুষে ছোট ভাইকে দেয়, আর তুইতো দিবিনে কোনোদিন কিন্তু নেবার বেলায় পটু, ফিরিয়ে দে। অধীর বলল, আমাকে নিয়ে চল নিতাইদা। নিতাই বলল, ওদিকে বড় অসুখ শুরু হয়েছে, তোমাকে আর একদিন নিয়ে যাব দাদা।

পুরানো দিনের কত কথা—কত কাহিনী জড়িত রামপাল। অমর শালগাছ, রাজমাতার দীঘি, কোদাল-ধোওয়া দীঘি, হরিশ্চন্দ্রের দীঘি, পীরসাহেবের কবর। বিগত যুগের স্বপ্ন দিয়ে গড়া, স্মৃতি দিয়ে ভরা এসব চিহ্নগুলির দিকে তাকাই, রূপকথার রাজকুমারীর মতো সোনার কাঠির ছোঁয়ায় যেন জেগে ওঠে আমার মর্মমূলের আনন্দ উৎসটা। একটা হারানো সম্পদ ফিরে পেয়ে আমি চলে যাই কোন এক স্বপ্নলোকে!

কোথা থেকে একটা কলাপাতায় ক'রে কয়েকটা সন্দেশ এনে নিতাই বলল, এই নে প্রসাদ, দেখিস্ আবার প্রণাম না করেই খেয়ে ফেলিস্নে। কা'র প্রসাদ? আগে প্রণাম করে নে না তুই। কীসের প্রসাদ, নিতাই? কলাপাতাটা আমার কপালে জোর ক'রে ঠেকিয়ে আমার মুখে দু'তিনটে সন্দেশ পুরে দিয়ে নিতাই বলল, তোর পরীক্ষার জন্য পীরসাহেবের দর্গাতে মানৎ করেছিলাম। আমি বললাম, তুমি বিশ্বাস কর ঠাকুর দেবতারা পাশ করিয়ে দেন পরীক্ষায়? —সবাই করে, তুইও করিস্। —তাহলে যারা পূজা দেয় সবাই পাশ করে না কেন? একটু রাগ করে নিতাই বলল, তুই বড় আহাম্মক রে সমীর। আগুন পোড়াতে পারে, জল ভেজাতে পারে, তাই

ব'লে কি সব কিছুকেই পারে? আমি বললাম, অনর্থক পুরোহিতকে খাওয়ানো। সে বলল, চুপ কর্, আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। ঐ যে আমার খুড়ীমার বাড়ী, চল্ দেখা করে যাই।

খুড়ীমা বাড়ী ছিলেন না। পাশের বাড়ী রুগী দেখতে গেছিলেন। আমরাও গেলাম সেখানে। অসহায় ব্যথার এমন করুণ রূপ আর দেখি নি। জীর্ণ ঘরে মলিন বিছানায় শায়িত মরণযাত্রী একটি ফুটফুটে ছোট মেয়ে কাঁদছে জল জল ব'লে, মাটিতে একটি আরও ছোট ছেলে কাঁদছে ভাত ভাত ব'লে, তাদের মা কাঁদছেন ভগবানের কাছে। খুড়ীমা আমাদের দেখে বাইরে এসে বললেন, মেয়েটিকে ডাবের জল ছাড়া অন্য জল দেওয়া ডাক্তারের নিষেধ। ঘরে ডাব নেই, ডাব কেনার পয়সাও নেই। ছেলেটিকে ভাত রেঁধে দেবার চালও নেই। এদের বাবা ছিলেন একটা বিখ্যাত কলেজের প্রফেসার, কিন্তু কঠিন ব্যাধিতে সর্বস্বান্ত হয়ে চাকরিটি হারিয়ে বর্তমানে আছেন স্বাস্থ্যনিবাসে।

আমরা কাছে যেতেই মেয়ে ছেলে মা তিনজনেই আশান্বিত হয়ে চাইল আমাদের দিকে। হয়তো মেয়ে মনে করল আমরা ডাব নিয়ে এসেছি, ছেলে মনে করল চারটি ভাত নিয়ে এসেছি তার জন্য, আর মা ভাবলেন কোনো একটা উপায় আমরা করে দিতে পারব তাঁর মেয়েকে বাঁচাবার।

পথে খুড়ীমা বললেন, এ বৌটির মতো এমন সুশিক্ষিত সত্যনিষ্ঠ পরোপকারী মানুষ এ গ্রামে আর নেই। মেয়েটিও হয়েছে মায়েরই মতো ভাল। ডাব না পেলে ওকে বাঁচানো যাবে না। একয়দিন দরিদ্র কৃষকরা দিয়েছে। তাদের গাছে আর ডাব

নেই। বাকী নারকেলগাছগুলির মালিক জমিদার। সপরিবারে শহরে থাকেন, বাড়ীর ফল বিক্রী ক'রে টাকা নিয়ে যান। অনেক চেয়েও তাঁর দ্বারোয়ানের কাছ থেকে একটি ডাব পাওয়া যায় নি।

একটু পরে সামন্তপুর রওনা হলাম। কানে কেবলি বাজতে লাগল 'জল' 'জল'। ধনীর গাছে ডাব ঝুলছে, কিন্তু দরিদ্রের প্রাণ রক্ষা হবে না। মানুষ নাকি কুকুর বিড়াল সবার চেয়ে ভাল! যাদের গাছে ডাব ঝুলছে তারা বিক্রী করে পয়সা পাবে। কী করবে পয়সা দিয়ে? বাবুয়ানা বা নেশা করবে। কানে আবার বাজল 'জল' 'জল'। অনেক রাত হ'ল সামন্তপুর ফিরতে। আমি বললাম, নিতাই, ডাবের জন্য মেয়েটার প্রাণ যাবে, কয়েকটা ডাব দিয়ে এলে হয় না ওদের? নিতাই বলল, কোত্থেকে দেব, আমাদের কি ডাব আছে না কী? —কিন্তু মেয়েটা যে মরে যাবে। —মরবে তো আমাদের কী? আর ওর যদি আয়ু থেকে থাকে তাহলে কেউ না কেউ ওকে ডাব দেবেই, কিছুতেই মরবে না।

চুপ করে রইলাম। নিতাই তাদের বাড়ী গেল। আমি আমাদের বাড়ী এলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারলাম না। কোনোমতে টমকে শান্ত করে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে ছুরিটা নিয়ে অন্ধকারে চুপিচুপি চল্লে গেলাম স্কুলের সেক্রেটারী ও ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট মিত্রমশাইর বাড়ী।

অসংখ্য নারকেল ধরেছে তাঁদের গাছটাতে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, গাছটা মিত্রমশাইর শোবার ঘরের একেবারে গায়ে। ভিতরে থাকেন মিত্রমশাই বন্দুক নিয়ে, আর বারান্দায় থাকে

চৌকিদার বল্লম নিয়ে। ঘরের শিকলটা বাইরে থেকে তুলে দিতেই আমার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের কুকুরটা। চমকে উঠে আমার ভারি গায়ের চাদরটা দিয়ে তার মুখটা জড়িয়ে ধ'রে তুলে নিয়ে গেলাম অনেক দূরে জংগলের মধ্যে পুকুরটার পাড়ে। ল্যাজটা ধরে চরকির মতো ভোঁ ভোঁ করে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম পুকুরের মধ্যে কচুরি পানার ভিতর। ফিরে এসে গাছে উঠে ছুরি দিয়ে এক কাঁদি নারকেল কেটে খুব সন্তর্পণে অর্ধেকটা নেমেছি, পেটের মধ্যে কি একটা পোকা কামড়ে দিলে। হাতটা নাড়তেই নারকেলের কাঁদিটা পড়ে গেল ঘরের টিনের উপর। বিকট ক্রম শব্দে চকিত হয়ে উঠল সমস্ত পাড়াটা। এক লাফে মাটিতে পড়ে কাঁদিটা তুলে নিয়ে দিলাম ছুট রামপালের দিকে।

ডাবগুলি রুগ্ন মেয়েটির মাকে দিয়ে সামন্তপুর ফিরলাম শেষ রাত্তিরে। মিত্রমশাইর বাড়ীর চারদিকে তখন মহাহুলস্থুল বেঁধে গেছে চোর ধরার জন্য। আমাদের বাড়ীর দরজার কাছে মা ব'সে আছেন চাবুক হাতে। আমি চুপিচুপি পালিয়ে গেলাম জংগলের ভাংগা দেউলটার মধ্যে। এখন কী করি? বাড়ী ফিরলেই মা জিগেগেস করবেন এত রাত্রে কোথা থেকে এলাম। দু'একদিন পরে বাড়ী গেলে মনে করবেন আমি কোনো বন্ধুর বাড়ী ছিলাম। না ব'লে দু'একদিন বাইরে থাকলে মা রাগ করলেও ঘৃণা করবেন না। কিন্তু যাব কোথায়? এখানে থাকতে পারি, কিন্তু খাব কী? খিদেয় যে পেট ব্যথা করছে।

দুপুরবেলা খিদেয় ছট্‌ফট্ করতে লাগলাম। নিতাইর

দেশলাইটা ভুলে ফেলে গেছে আমার কাছে। কিছু রান্না করে খাওয়া যায় না? ঘুঘুর বাচ্চা আছে ওই উঁচু জারুল গাছটার ডগায়। বেশ লাগবে পুড়িয়ে খেতে। অমনি গাছে উঠে বাচ্চা দুটাকে কোঁচড়ে নিয়ে সানন্দে নামতে লাগলাম। মা-পাখীটা এসে কিচিরমিচির্ ক'রে উড়তে লাগল আমার চারদিকে। তারপর আর্তনাদ শুরু করল। তারপর আমার মাথায় মুখে ঠোকরাতে লাগল। আশ্চর্য হয়ে গেলাম ঘুঘুর মতো নিরীহ পাখীর এরকম তেজ দেখে। তবু আমি নেমে যাচ্ছি দেখে সে এসে আমার বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ল। ধ'রে ছু'ড়ে ফেলে দিলাম পাখীটাকে। কিন্তু আবার সে জীবনের মায়া ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকে। তাহলে যে জড়বাদীরা বলে আপন জীবন বাঁচানোটাই জীবের প্রধান স্বার্থ, স্নেহ ভালবাসা দয়া মায়া সাহস সততা প্রভৃতি মহৎ ভাবগুলি নাকি জীবনের কাছে তুচ্ছ! ধীরে ধীরে উপরে উঠে বাচ্চাগুলিকে বাসায় রেখে আমি নেমে পড়লাম। অন্তরের কাছে পরাজয় স্বীকার করলাম। এদিক ওদিক তাকালাম, কেউ আবার লজ্জাস্কর ব্যাপারটা দেখে ফেলল কিনা।

না নেয়ে না খেয়ে বসে ছিলাম। নিতাই এসে হাজির হ'ল। বলল, আমি সবাইকে বলেছি তুই রামপাল থেকে শহরে গেছিস্, চল্ শহরে যাই। শহর সম্বন্ধে শুধু স্বপ্নই রচনা করেছি, চোখে দেখিনি। রাজী হলাম শহরে যেতে। নিতাই জানত আমার সংগে পয়সা আছে, তাই হয়ত ফুর্তি করতে চায়।

সাত

শহরের পথে নিতাই প্রথম দিল খেয়ার মাঝিকে ফাঁকি, পরে দিল রেলকোম্পানীকে ধোঁকা। বিনেপয়সার যাত্রীদের কিভাবে চলাফেরা করতে হয় সেবিষয়ে সে একেবারে ওস্তাদ। এর আগেও সে কয়েকবার শহরে গিয়েছিল, আর আমি শহরের ধারেও যাই নি। সে স্ববাদে নিজ থেকেই সে আমার অভিভাবক হয়ে গেল। আমি তার হাতে আপনাকে ছেড়ে দিয়ে শহর সম্বন্ধে অদ্ভুত গল্প শুনতে শুনতে নিশ্চিন্তমনে পথ চলতে লাগলাম।

সন্ধ্যার সময় শহরে পৌছলাম। রাস্তা থেকে বিড়ির টুকরাগুলি কুড়িয়ে আগুন জ্বালিয়ে নিতাই টানতে লাগল। জ্বালাবার ও টানবার ভংগীটা তার ঠিক ওস্তাদের মতো। এত লোক যে তাকে বিড়ি খেতে দেখছে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। এদিকে পুলকের বান ডাকল আমার মনের গাংগে। আমি আজই প্রথম রেলগাড়ী দেখেছি, তাতে চড়েছি। এখন দেখছি ইলেক্‌টি্রক লাইট। টুক করে আলোটা আপনা থেকে জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়। রাস্তার ধারে লোহার নল বেয়ে জল পড়ে। পরিষ্কার ফটিকের মতো জল। আমি এ কল থেকে একটু জল খাই, আবার আর একটু এগিয়ে আর একটা কল থেকে আরএকটু জল খাই। জল খেতে খেতে পেটটা ঢোল হয়ে গেল। শহর দেখার

এতকালের স্বপ্ন সফল হওয়ায় আমার মনটা নিতাইর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। পরম তৃপ্তির সহিত বিড়ি টানছিল সে। দেখে আমারও খুব লোভ হ'ল একটা বিড়ি খেতে। বললাম, আমাকে একটুকরা বিড়ি দাও না নিতাই। প্রবীণ ব্যক্তির মতো গম্ভীরভাবে অস্বীকার ক'রে সে বলল, বিড়ি খেলে লেখাপড়া হয় না। তার চেয়ে বরং চল্, ঘোড়ার গাড়ীর পেছনে চেপে বিনেপয়সায় শহর ঘুরি গে। এমন মজার জিনিস আর নেই। যে কোনো একটা গাড়ীর পেছনে চড়ে যতদূর ইচ্ছে চলে গেলেই হ'লো। আবার ফিরতি একটা গাড়ীর পেছনে চড়ে এলে শালা গাড়োয়ানের বাবাও টের পাবে না।

কথাটা আমার মনে খুব ধরল। দুজনে চেপে বসলাম দুটা গাড়ীর পেছনে। ঘর্ ঘর্ শব্দে চলল গাড়ী। ফুরফুরে হাওয়ার আমেজে বেশ একটু অহংকার হল মনে। বুকটা ফুলে উঠল পায়ে চলা পথিকদের চেয়ে নিজেকে উঁচু মনে ক'রে। হঠাৎ একটা দুষ্টু ছেলে চীৎকার ক'রে আমার গাড়ীর গাড়োয়ানকে ডেকে বলল, গাড়োয়ান পিছে বাড়ি। ছেলেটার কথা শেষ হ'তে না হতেই শাঁই ক'রে গাড়োয়ানের চাবুকের বাড়ি এসে পড়ল আমার উপর। পিঠ কচলাতে কচলাতে আমি লাফিয়ে পড়লাম রাস্তায়। সংগে সংগে নিতাইও লাফিয়ে পড়ল তার গাড়ী থেকে। বিষণ্নমুখে এসে হাত বুলাতে লাগল আমার পিঠে, যেন সে-ই দায়ী আমার ব্যথার জন্যে।

রাত্রিতে পড়লাম নূতন এক মুস্কিলে। শহরে রওনা হওয়ার আগে নিতাই একবার জিগগেস করেছিল আমি আমার বড়দাদুর

বাসার ঠিকানা জানি কিনা। আমি জানতাম কোন্ পাড়ায় বাসাটা। শহরের ঠিকানা জানতে হলে যে আবার রাস্তার নাম ও বাসার নম্বর জানতে হয় তা জানতাম না। তাই আমি বলেছিলাম, জানি। এখন কিছুতেই বাসাটা খুঁজে পাই নে। অথচ অন্য কোন বাসাও আমরা কেউ জানি নে। এদিকে বেশী রাত্রি বাইরে থাকলে যে পুলিশে ধরবে সে ভয়টাও ছিল পুরামাত্রায়।

যে বাসায় জিগগেস করি তারাই বিরক্ত হয়ে দরজাটা একটু খোলে, তারপর কঠিনভাবে 'জানি নে' ব'লেই ঠাস্ ক'রে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। কোনো মায়া মমতা নেই যেন মনে। গ্রামে আমরা এসব কখনও দেখি নি, ভাবতেও পারিনি। গ্রামে কেউ এসে কোনো বাড়ীর কথা জিগগেস করলে কত উৎসাহের সহিত তাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌছিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষুধার্ত হ'লে খাইয়ে দেওয়া হয়। অন্ধকার হ'লে সংগে আলো দেওয়া হয়। আমাদের ধারণা ছিল শহরের লোকেরা বেশী লেখাপড়া জানে, তাদের অনেক টাকাপয়সা আছে, তারা গ্রামের লোকদের চেয়ে অনেক ভাল। তাদের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। কেমন একটা অসহায় বোধ করতে লাগলাম।

অবশেষে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলল। বড়দাদুর বাসাটা যেখানেই থাক না কেন, তাঁরা নিশ্চয়ই মুদিখানা থেকে সওদা নেন। এত বছরে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ও হয়েছে তার সংগে। অতএব মুদিখানা দেখামাত্রই সেখানে জিগগেস করতে লাগলাম তারা বড়দাদুর বাসা চেনে কিনা। অনেকক্ষণ পর

এক দোকানী বলল, আমি চিনি তাঁর বাসা, ৬২ নং কলুটোলা লেন। দোকানীর কথা মতো আমরা চলতে লাগলাম।

বহুদূর থেকে বিরাট গোলাকার দুটা চোখের মতো আলো খাই খাই ক'রে ছুটে আসছিল আমাদের দিকে। আমার হাত ধ'রে একটা টান দিয়ে নিতাই বলল, মটরগাড়ী আসছে, একধারে সরে আয়, নীচে পড়লে একেবারে চুরমার হয়ে যাবি। এর আগে আমি আর মটরগাড়ী দেখি নি, এখনও শুধু চোখদুটাই দেখতে পাচ্ছিলাম। জিনিসটা কি কিছুই বুঝতে না পেরে ভয়ে গিয়ে লাফিয়ে উঠলাম পাশের বাড়ীর সিঁড়িটার উপর। কিন্তু সেখানেও নিশ্চিন্ত হতে না পেরে ছুটে চলে গেলাম পাশের মাঠটার ওপারে।

মটরগাড়ীটা চলে গেলে আমি নিতাইর কাছে এলাম। নিতাই বলল, তুই কি আহাম্মক রে, অতদূর যেতে আছে! আমি বললাম, কেন মটরগাড়ীটা এসে আমার গায়ের উপরও তো উঠতে পারত। নিতাই বলল, তা কি ক'রে হবে, পুলিশ আছে না? আমি বললাম, আমি মরে গেলে পুলিশ ওদের ধরলেই বা কী উপকারটা হ'ত আমার?

শহরের বাড়ীতে যে কড়া নাড়তে হয় তা আমি জানতাম না। ধুপ্ ধাপ্ ধাক্কাতে শুরু করলাম দরজাটা। ভিতর থেকে ভয়ানক বিরক্ত হয়ে বিড় বিড় করতে করতে একজন দরজা খুলে দিল, কিন্তু চিনতে পারল না আমাকে। সংগে সংগে আরও দুএকজন বেরিয়ে এল। তারাও পারল না চিনতে। এমন সময়ে একটি মেয়ে এসে বলল, আরে এ যে রাংগাদির ছেলে সমীর।

শুনে সবাই খুশীতে ভরে উঠল। বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল আমাকে।

অতিশয় দরিদ্র হয়েও মা কখনও তাঁর ধনী বাবা কিংবা মামার সাহায্য কিছুতেই নিতেন না। এজন্য মা'র উপর বিরক্ত হলেও তাঁকে শ্রদ্ধা করত সবাই। লেখাপড়ায় ভাল বলে তাঁর ছেলেমেয়েদের উপরও খুব স্নেহ ছিল সবার। এতরাত্রে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আমাকে পেয়ে মামা মাসীমা বড়দিদিমার আনন্দ আর ধরে না। আমি যা বলি তাই তাঁরা মন দিয়ে শোনেন আর হাসেন। ছোটমাসীমা তখনই সেলাইর কল নিয়ে বসে গেলেন আমাকে একটা জামা বানিয়ে দিতে। এমনসময়ে বড়দাদু অন্যঘর থেকে বড়দিদিমাকে ডেকে বললেন, ওগো পেটুক শালাকে আগে খেতে দাও, সারাদিন হয়তো না খেয়েই রয়েছে। সবাইকে প্রণাম ক'রে ছোটদিদিমার কাছে যেতেই তিনি মালা জপা বন্ধ রেখে প্রায় মারমুখী হয়ে বলে উঠলেন, আবার এয়েছ জালিয়ে মারতে, অরিলংকা কোথাকার। তখনি ছোটমাসীমা এসে আমাকে নিয়ে গেলেন ওখান থেকে।

বড়দিদিমা আমাকে জিগগেস করলেন, কার সংগে এসেছ দাদু? এতক্ষণে আমার খেয়াল হ'ল নিতাই যে একা বারান্দায় বসে আছে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার কাছে যেতেই সে বলল, তুই এখানে থাক, সমীর, আমি আমার দিদির বাড়ী যাই। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম তার অসম্ভব কথা শুনে। নদী পার হয়ে চার পাঁচ মাইল জংগলাকীর্ণ বিপদসংকুল গ্রাম্য পথ হেটে যেতে হয় নিতাইর দিদির বাড়ী। এত রাত্রে খেয়া নৌকা না থাকারই সম্ভাবনা।

তাহলে শীতের মধ্যে সারারাত্রি তাকে অন্ধকারে শ্মশানে বসে থাকতে হবে। নিতাই আমার হাতে পাঁচ আনার পয়সা দিয়ে অত্যন্ত মিনতির স্বরে বলল, যাবার সময় রেলকোম্পানীকে যা খেয়ামাঝিকে ঠকাস্ নে, আর পথে রুটি কিনে খাস্, উপোস করিস্ নে। আমি বললাম, আমিও যাব তোমার সংগে। সে বলল, তাহলে তোর বড়দিদিমাকে বলে আয়।

আমার কথা শুনে বড়দিদিমা তো রেগে মেগে আগুন। আমার মায়ের অসাবধানতার জন্যই যে আমি এমন বেপরোয়া হয়ে গেছি সেকথা বারেবারে বলতে বলতে তিনি নিতাইকে নিরস্ত করতে আমার সংগে বারান্দায় এলেন। কিন্তু নিতাই তখন নিরুদ্দেশ।

নিতাই চলে যাওয়াতে আমারও শহর দেখার শখটা চলে গেল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কেন সে হঠাৎ চলে গেল। শ্মশানটার মধ্যে ভূতের ভয় আছে। আমার ভূতের ভয় না থাকলেও নিতাইর খুব বেশী আছে। অবশ্য নিতাইর মতো দুর্ধর্ষ ছেলের পক্ষে ভূতের ভয় থাকাটা খুবই হাস্যাস্পদ। তবু এরকমই হয়। জড়বাদী চিন্তা দিয়ে কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না এর। জড়বাদ বলে জীবনই মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। তাহলে যে-লোক মরণকে ভয় করে না সে ভূতকে ভয় করে কেন? যে শিকারী বাঘকে ভয় করে না সে কুকুরকে ভয় করে কেন? সাপকে যে ভয় করে না, বিছাকে সে ভয় করে কেন? একবার আমার এক মাসতুতো ভাই কোনো কারণে অনেক রাত্রে জংগলে গেছিল আত্মহত্যা করতে। টের পেয়ে একটা হাড়ি সংগে ক'রে

আমিও গিয়েছিলাম তার পেছনে পেছনে। গলায় ফাঁসী প'রে ঝুলে পড়বে এমনসময়ে হাড়ির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে গোঁ গোঁ করে চীৎকার করে উঠলাম আমি। অমনি ফাঁসীর রশি ফেলে দিয়ে মাগো মাগো করতে করতে সে পালিয়ে গেল বাড়ীতে। মরণযাত্রীরও এ ভূতের ভয় কেন? আবার, সে ভয়কেও নিতাই আজ তুচ্ছ করল কিসের জোরে? ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। মনে পড়ল সেজমামীমার মিলিটারী মূর্তিখানা, আর তার সেই কথাটা—আবার কে এল জ্বালাতে এ দুপুররাতে!

পরদিন সকালে মামারা বেড়াতে বেরোলেন আমাকে নিয়ে। অনেক জায়গা বেড়ালেন। আজ জেলাশহর হলেও মোগলদের আমলে এটা ছিল রাজধানী। অনেক দেখার জিনিস আছে এখানে। বুড়ীগংগার তীরে দেবাংশী কামান, নাম কালু খাঁ। কত লোক এসে তেল সিন্দুর দিয়ে পূজা করে তাকে। তার মুখের মধ্যে হাত দিলে নাকি গপ্‌ করে গিলে ফেলে হাতটা। কামান দেখে গেলাম যাদুঘর দেখতে। যাদুঘরের কর্তা বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর ভট্টশালী সামন্তপুরের মানুষ, আমার বড়দার মাষ্টারমশাই। একটা পাথরে খোদা ছিল আকবরের বংগবিজয়ের যুদ্ধের সন। আমি সেটা দেখিয়ে একজন কর্মচারীকে বললাম, এটা ভুল, এখানে ১৫৭৪ না হয়ে ১৫৭৬ হবে। কর্মচারীমশাই তো আমার উপর খুব অসন্তুষ্ট হলেন। আমার মামারাও খুব সংকুচিত হয়ে চুপ করে রইলেন। ডক্টর ভট্টশালী আমাদের কথাবার্তা শুনে কাছে এলেন। একটু চিন্তা ক'রে বললেন

আমার কথাই ঠিক। তারপর যখন শুনলেন আমি সামন্তপুরের ছেলে তখন গর্বে আনন্দে তাঁর মুখ উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠল। আমার মামারাও খুব খুশী হলেন। তারপর আরও অনেক জায়গায় বেড়ালেন। কখনও বা মিষ্টির দোকানে ঢোকেন, কখনও বা পার্কে বসেন, কখনও বা গাড়ীতে চড়েন। কি যে আমাকে নিয়ে করবেন তা তাঁরা ঠিক করতে পারেন না।

ফেরার পথে আমরা ডাকঘরের পাশ দিয়ে চলছিলাম। চিঠি আনতে মামারা ভিতরে গেলেন। এদিকে আমার বুকের রক্ত ভয়ে হিম হয়ে গেল। আমাকে বাড়ী ফিরতে না দেখে মা নিশ্চয়ই চিঠি লিখেছেন দিদিমার কাছে। সোজা চম্পট দিলাম গলি ঘুপচির ভিতর দিয়ে। অনেকটা ছুটে গিয়ে যে বাড়ীটার দুয়ারে দাঁড়িয়ে হাপাচ্ছিলাম সেখানে খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—কমলে কামিনী। তার উপরে লেখা—সিনেমা প্যালেস্। ছবি মানুষের মতো কথা বলে, যুদ্ধ করে, এ কি সত্যি সম্ভব? পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার সমস্ত গাটা। একটা টিকিট কিনলাম চার আনা দিয়ে। তখনও ছবি আরম্ভ হতে তিন ঘণ্টা দেরি আছে, দরজা বন্ধ। কিন্তু আমি সিনেমা-ঘরের দুয়ার ছেড়ে অন্যত্র যেতে ভরসা পেলাম না, যদি দরজা খুলে আমাকে ঘরে না নিয়েই আবার বন্ধ করে দেয়? যথাসময়ে দরজা খুলল। আমি গিয়ে আসনে বসলাম। তবু আমার ভয় ঘোচে না। যদি কোন কারণে আরম্ভ না হয় ছবিটা? যথাসময়ে আরম্ভ হ'ল। নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান মনে করে আমি তন্ময় হয়ে দেখলাম ছবিটা। ঘণ্টা দেড়েক পরে হঠাৎ ছবিটা বন্ধ হ'ল, সংগে

সংগে বাতি জ্বলে উঠল। শেষ হয়ে গেল দেখে অমনি আমি বেরিয়ে ষ্টেশনে চলে এলাম।

পরদিন খেয়ানৌকা থেকে নেমেই দেখলাম একটা বিরাট সভা হবে ষ্টেশনের মাঠে। ইংরেজসরকার জালিয়ানওয়ালাবাগে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড করেছিল নিরস্ত্র নিরীহ ভারতবাসী নরনারীর উপর তারই প্রতিবাদে এই বিপুল জনসভা। বন্দেমাতরম্, মহাত্মা গান্ধী কী জয়, দেশবন্ধু দাস কী জয় প্রভৃতি ধ্বনি করতে করতে একটা শোভাযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছিল সভার দিকে। এমন অদ্ভুত জিনিস আগে আর কখনও দেখি নি। তবে আমি জানতাম যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করে মা তাদের খুব ভালবাসেন। আমিও গিয়ে যোগ দিলাম শোভাযাত্রার সংগে।

অসংখ্য বন্দুকধারী পুলিশ উগ্রমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সভার মাঠটার চারদিকে। সমস্ত প্রকার স্বদেশী আন্দোলনকে নিষ্ঠুরভাবে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার একজন অত্যাচারী জমিদার যুবককে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিযুক্ত করেছিলেন। তার নাম বিভু সেন। রিভলভার হস্তে বিভুসেন দাঁড়িয়ে ছিল মাঠে ঢোকার পথে। পুলিশের মাথার লালপাগড়ি আর বন্দুকের মাথার সংগিনগুলি চিকমিক করছিল রোদের ঝলকে।

আমাদের শোভাযাত্রাটা থেমে গেল মাঠের কাছে গিয়ে। নেতারা ইতস্ততঃ করতে লাগলেন, কী করবেন? পুলিশ লাঠি উঠাতেই অনেক দর্শক সরেও পড়ল। এমনসময়ে দেশবন্ধুকে নিয়ে ষ্টীমার এসে পড়ল তীরের নিকটে। ডেকের উপরে দেশবন্ধুকে দাঁড়ানো দেখে একজন অগ্রবর্তী নেতা চীৎকার করে উঠলেন,

দেশবন্ধু দাশ কী জয়। আকাশ পাতাল ভেদ ক'রে সহস্র সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ল তাঁর সে জয়ধ্বনি। স্লোগ্যান বা সংঘধ্বনি যে কী, অধিকারীর মুখ থেকে উপযুক্ত সংঘধ্বনি যে কী করতে পারে তা বোঝা যায় না এ দৃশ্য না দেখলে।

কোথায় চলে গেল পুলিশের ভয়। পুলিশের বেড়া ভেংগে আমরা কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়লাম ষ্টীমার ঘাটের দিকে। পুলিশ লাঠি চালাল, বিভূসেন রিভলভার চালাল, মাথা ফাটল, লোক পড়ল, তবু সমস্ত জনতা ছুটল আমাদের পেছনে পেছনে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ দেশবন্ধুর ষ্টীমার পাড়ে ভিড়তে দিল না। শোভাযাত্রার প্রথম থেকে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে সভা ভেংগে দিল।

ধৃত পাঁচজনের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন। ভদ্রলোক হয়েও আমি এলাম চোর ডাকাতের জায়গা জেলখানায়। তবু দুঃখ না হয়ে বরং অহংকারই হ'ল আমার। সাধনার দুঃখ হয় যতো তীব্র, সাধকের গর্বও হয় যেন তত বিপুল।

কয়েকদিন জেলে থাকার পর আমাদের বিচার হ'ল। নিতান্ত কম বয়স ব'লে আমি খালাস পেলাম। বেরিয়েই প্রথম দেখা হ'ল টমের সংগে। আমাকে একটু আদর জানিয়ে ভোঁ দৌড় দিল আমাদের বাড়ীর দিকে। কী ক'রে সে জানল আমার কথা বুঝতে পারলাম না।

পথে যেতে যেতে দেখলাম গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে গেছে আমার বীরত্ব কাহিনী। কেউ আমাকে চেনে না, তবু সবাই বলাবলি ক'রে আমার কথা। আমার মতো বীরবালকের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা উচিত, আমাকে চোখের দেখা দেখলেও পুণ্য হয়

ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাদের সেই সুমহান বীরবালকটি যে তাদেরই কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছে সেকথা জানতেও পারে না তারা।

সবচেয়ে মজা হল খালের খেয়াঘাটে। কর্তা মাঝি বলছিল, রায়েগ ছেইলা সমীরের মতন মানুষের লাইগা সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিলে জীবন সার্থক হয়। আমি তাকে বললাম, আমার সংগে পয়সা নেই, দয়া ক'রে যদি পার করে দেন তাহলে বড় উপকার হয়। সে উত্তর দিল, পয়সা না থাকে তো নৌকায় চড়ার শখ কেন হে বাপু, সাতরাইয়া খাল পার হইতে পার না! আর কোনো কথা না ব'লে আমি সাঁতরিয়েই খালটা পার হলাম।

আত্মপরিচয় না দিয়ে কেন জলে নামাটাই শ্রেয় মনে করলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আমার মনে হ'ল কাজটা ভালই করলাম। বেশীর ভাগ মানুষই গুণকে আদর করে না, করে গুণের যশকে। গুণীকে ভালবাসে না, চায় শুধু তার যশের ছটায় নিজেকে যশস্বী করতে। সত্যিকার গুণীকে জেনে চিনেও আদর করে না যতদিন সে অখ্যাত থাকে, কিন্তু অকস্মাৎ দৈবের বশে সে যশস্বী হয়ে উঠলেই ঘিরে ধরে তাকে। সুতরাং মানুষ হিসাবে যখন মাঝিদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হলাম তখন আর ইচ্ছে হ'ল না নিজের যশটুকু বিক্রী ক'রে কোনো সুবিধা লাভ করতে।

সামন্তপুরের কাছে আসতেই মনে হ'ল এখানকার মাঠঘাট নদীনালা গাছপালা পশুপাখী নরনারী সবাই অধীর হয়ে আছে আমার পথ চেয়ে। আমার গাঁয়ের নদীর তান, পাখীর গান,

আমের বাগান, আমার গাঁয়ের খেলাধূলা, পূজাপার্বন, উৎসব আয়োজন সবই যেন একটু বেশী মিষ্টি অন্য জায়গার চেয়ে। এদের সংগে মিশে আছে আমার দেহ মন, বিগত কত পুরুষের অস্থি পঞ্জর, অন্তরের অন্তর। এরা আমার আপন, একান্ত আপন।

যার সংগে দেখা হয় সেই করে আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। কেউ বলে উজ্জ্বল রত্ন, কেউ বলে বীরসৈনিক, আর আমার মাকে বলে রত্নগর্ভা, বীরপ্রসবিনী। কয়েকজন্ আমাকে নিয়ে গেল কংগ্রেস আপিসে। আমার সম্মানার্থে সেখানে একটা সভা হ'ল। কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং আমার গলায় মালা পরিয়ে দিলেন, আর তাঁর স্ত্রী, বিনতার মা চন্দন তিলক এঁকে দিলেন আমার কপালে। অনেকে অনেক বক্তৃতা করলেন আমার প্রশংসায়। তারপরে সর্বসম্মতিক্রমে আমাকে নির্বাচিত করলেন বালকবাহিনীর অধিনায়ক।

আমার মা'র কানেও ইতিমধ্যেই গিয়েছিল আমার গৌরবের কথা। ১৯২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তখনও সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়েনি। একটি লোক দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করলে সবাই গর্ব করত তাকে নিয়ে। সে কারাবরণ করলে তাকে মাথায় করে নাচত সবাই। আমার মাও খুব খুশী হয়েছেন আমার উপর তা ভেবে পুলকে অধীর হয়ে উঠলাম আমি। আমার মাকে খুশী করা কি সহজ কথা! আমাদের এত কাছে থেকেও তিনি যেন বিচরণ করেন কোন্ সুদূরে।

বাড়ীতে ঢুকতে দেখি মা বসে আছেন গম্ভীর মুখে।

বললেন, তোকে যে গভর্ণমেণ্ট জেলে রাখে নি ভালই ক'রেছে। তোর জন্য আছে চোর-ডাকাতের জেল, স্বদেশীওলার জেল নয়। তুই মিস্তিরদের নারকেল চুরি করেছিস্?

নিরাশ হয়ে গেলাম। অনেক আশা করে এসেছিলাম মাকে খুশী দেখব। খুশী দূরের কথা, আমার সকল যশ গৌরব বুঝি এখনি অকূলে ভেসে যায়। আমাকে অভিনন্দন করতে প্রতিবেশী বালকবালিকারা ফুলের মালা নিয়ে এসেছিল, অন্যান্য অনেক নরনারীও এসেছিলেন দেখতে। এত লোকের সামনে আমি কিছু না বলে চুপ করে রইলাম। মা আবার জিগগেস করলেন, করেছিস্ তুই চুরি? কিন্তু মা'র অসম্ভব কথাকে সবাই হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, সমীরের মতো মহৎ ছেলে কি চুরি করতে পারে, অসম্ভব।

আমি আজ গৌরবের সুউচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। সম্মুখে সুমহান ভবিষ্যত। আমার যশোমুগ্ধ এসব লোকদের সম্মুখে যদি আমি চুরির কথা স্বীকার করি তাহলে সবাই আমাকে ঘৃণা করবে, মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে আমার গৌরবের বিশাল সৌধ। আর যদি বলি 'না' তাহলেই অক্ষুন্ন রাখতে পারি সকল গৌরব। আবার মা জিগগেস করলেন, করেছিস্ তুই নারকেল চুরি?

যদি আমি 'হাঁ' বলি তাহলে কারও কিছু লাভ হবে না, অথচ আমি সমাজসেবার কাজ থেকে বঞ্চিত হব, কেউ আমাকে আর বিশ্বাস ক'রে সমাজসেবার কাজে ডাকবে না। তাতে আমারও ক্ষতি হবে, সমাজেরও ক্ষতি হবে। বড় রাগ হ'ল মা'র উপর। আমার স্বভাবটা গোপনে সংশোধন করিয়ে নিলেই তো

পারতেন। কিন্তু এখানেই ছিল মায়ের ঘোর আপত্তি। তিনি বলতেন ভয় পেয়ে নিজের দোষ লুকানো থেকে কারও কোনো কল্যাণ আসতে পারে না। গোপনীয়তার আশ্রয় মানুষ নেয় নিজের অহংকারকে বজায় রাখতে, কারও কল্যাণ সাধন করতে নয়। তুমি যদি সমাজের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই থাক তাহলে তোমার আবার অহংকার থাকবে কেন? নিশ্চয় তোমার লক্ষ্য নিজেকে বড় করা।

আমি দোষ স্বীকার করলাম। আমার প্রশংসাকারীদের মুখগুলি বিষণ্ণ হয়ে গেল। যেকোনো অবস্থাতে হউক, যত ক্ষতি স্বীকার করে হউক, শেষ পর্যন্ত আমি কিছুতেই সত্যি কথাটা না বলে পারি নে। পরিহাসচ্ছলেও কোথাও কোনো মিথ্যা কথা বলেছি একথাটা ভাবতেও ঘৃণায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে আমার দেহ মন। মিথ্যার ন্যায় আত্মহত্যার এমন তীব্র ভীষণ বিষ যে আর কিছু নেই। অন্যসব পাপের বিচারকর্তা বাইরের মানুষ, আমার ভিতরের সত্যি মিথ্যার বিচারকর্তা যে আমি নিজে। মিথ্যা বললে যে আমি নিজেই হব দুর্বল ও অপমানিত। তাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না। আমি জানতাম মা শুধু আমাকে সন্দেহ করছেন অত উঁচু নারকেলগাছে পাড়ার আর কেউ উঠতে পারে না ব'লে এবং মিত্তিরদের কুকুরটাকে আমি ছাড়া আর সবাই ভয় পায় ব'লে, কিন্তু আমি দোষ অস্বীকার করলে কিছুই বলতে পারতেন না তিনি। তবু আমি বললাম, আমি করেছি নারকেল চুরি।

সমস্ত লোকের ধিক্কারের মধ্যে পিসীমা এসে আমাকে বাবার

কাছে নিয়ে গেলেন। হঠাৎ বাবার শরীর খারাপ করেছে শুনে মাও সংগে সংগে ছুটে এলেন বাবার কাছে। আমি কিন্তু খুব আশ্বস্ত হলাম চুরি করা ও পালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে আর মার খেতে হবে না ভেবে।

মাটিতে বিছানার উপর কয়েকটা বালিশে হেলান দিয়ে বাবা বসেছিলেন। আমি কাছে বসতেই আমার পিঠে হাত বুলাতে লাগলেন। চোখ দিয়ে তাঁর ফোটা ফোটা জল পড়তে লাগল। আমি পরীক্ষায় ভাল পাশ করেছি বলে তিনি চাকরির জায়গা থেকে আসার সময় আমার জন্য ভাল কাপড় জামা এনেছিলেন সেগুলি আমাকে পরিয়ে দিয়ে তাঁর সামনেই পিসীমা আমাকে খেতে দিলেন। আমি খুব খেতে পারতাম, আমার সে খাওয়া দেখে দেখে বাবার আর আশ মিটত না।

বাবার অবস্থা দেখে আমার কান্না পেল। চোখে তাঁর অসীম স্নেহ, গভীর উদ্বেগ। অভাবে অনটনে কঠোর পরিশ্রমে আগেই রুগ্ন হয়েছিলেন। বড়দা জেলে যাওয়াতে তা আরও বেড়ে যায়। আমি পালিয়ে যাওয়াতে অনেক ছুটাছুটি করেছিলেন আমাকে খুঁজতে। তারওপর জেল হয়ে আমার ভবিষ্যত উন্নতির সমস্ত পথ বন্ধ হওয়াতে তিনি একেবারে শয্যা গ্রহণ করলেন। কবিরাজ নাকি বলেছেন বাবার অসুখ আর ভাল নাও হতে পারে।

কত কথা মনে পড়ল। আমি কথা বলতে শেখার পর থেকে আমার মুখের 'বাবা' ডাক শোনার জন্য কি আকুল আকাংখা বাবার। আমি 'বাবা' ডাকি না ব'লে কত ব্যথিত হন

তিনি। অন্য ছেলেমেয়েদের মতো 'বাবা' ডাকতে আমার কত ইচ্ছে করে তবু কিসের একটা লজ্জা এসে চেপে ধরে আমার মুখটা।

একয়দিন ভাল ঘুম হয় নি। সন্ধ্যা হতেই ঘুম পেল। বাবার কাছেই শুয়ে রইলাম। শুয়ে শুয়ে কত কথা শুনতে লাগলাম—ছিঃ বাবা, অমন করে কি পালিয়ে যেতে আছে। তোমার মা পিসীমা দিদিরা কত কান্নাকাটি করেছেন যে। কখখনও কষ্ট দিয়ো না তাঁদের মনে। বড় হয়ে অনেক লেখাপড়া শিখো, মায়ের মতো সত্যি কথা বলো।

একটা গোলমালে ঘুম ভেংগে গেল। কেমন করে যেন গা এলিয়ে দিয়ে বাবা শুয়ে আছেন। মা আড়ষ্ট হয়ে পড়ে আছেন তাঁর পাশে। দিদিরা আকুল হয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। বাইরে পিসীমার গগনভেদী বুকফাটা আর্তনাদ—ভাই রে, আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলি রে। সজল চোখে টম বারান্দায় বসে আছে ঘুমন্ত অধীরের কাছে। বাবার অসুখ কী তাহলে বেড়ে গেল?

কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম বাবা আমাদের আর নেই। আর তিনি উঠবেন না ঘুম থেকে। ধীরে ধীরে প্রতিবেশীরা সব এলেন আমাদের বাড়ীতে। শ্মশানে নিয়ে গেলেন বাবাকে। ভাল ক'রে না খেয়ে, ভাল কাপড় না পরে বাড়ী করেছিলেন, সে বাড়ীতে আর আসতে পাবেন না তিনি। কবে তাঁর ছেলেরা মানুষ হয়ে দেশের মুখোজ্জ্বল করবে তা নিয়ে কত স্বপ্ন দেখতেন, সব স্বপ্নের শেষ হয়ে গেল এখানে।

চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। উত্তপ্ত বাতাসের

শোঁ শোঁ শব্দের সংগে মিলিয়ে গেল শ্মশানবন্ধুদের গভীর দীর্ঘশ্বাস। আমার সংগে দিদিরাও এসে দেখতে লাগলেন এ মর্মন্তুদ দৃশ্য। বাবাকে দেখে লোকে বলত রূপকথার রাজকুমার, এত রূপ সংসারের মানুষের হয় না। সামান্যতম আঘাত লাগলেও বাবার শরীরে তা করুণ হয়ে ফুটে উঠত। দিদিরা তাঁকে প্রাণপণ সেবা করতেন সারিয়ে তুলতে। আজ সেই সোনার দেহখানি আগুনে পুড়তে দেখে দিদিরা আর্তনাদ করতে লাগলেন। আমার মনে পড়ল বাবার শেষ কথাগুলি — বড় হয়ে লেখাপড়া শিখো, তোমার মা'য়ের মতো সত্যি কথা বলো।

আগুন একটু একটু করে কমে আসে, একটা অসীম শূন্যতা এসে ছেয়ে ফেলে মনটা। আগুনের সংগে সংগে শেষ হয়ে যাবে আমাদের ধরিত্রীর শেষ সম্বলটি, জীবন হয়ে যাবে আশাহীন অর্থহীন। দিদিদের সমবয়সীরা এসে তাঁদের বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে গেল। হৈম মজিদ কার্তিক এসে আমাকে নিয়ে গেল। কিন্তু আমাদের বাড়ীটা আর আমাদের নিজেদের বাড়ী বলে মনে হ'ল না।

প্রতিবেশী প্রতিবেশিনীরা আপনা থেকেই এসে গ্রহণ করলেন আমাদের সব সাংসারিক কাজের ভার। ঘর দোর উঠান ধুয়ে মুছে দিলেন, সবার জন্য রান্না করলেন, ছোটভাই অধীরকে নাইয়ে খাইয়ে দিলেন। আমি খেলাম। মা পিসীমা দিদিরা কিছু মুখে দিলেন না। না নেয়ে না খেয়ে দিনের পর দিন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বসে রইলেন। সময় নেই, অসময় নেই, দিন নেই, রাত নেই, পিসীমা গিয়ে বাবার চিতার উপরে গড়াগড়ি যান আর আকুল হয়ে 'ভাই রে' 'ভাই রে' বলে আর্তনাদ করতে থাকেন।

আট

আসল্ সমস্যা দেখা দিল। আমরা খাব কী? পরব কী? ভেবে ভেবে মা পিসীমা পাগলের মতো হয়ে গেলেন। অধীর আর আমি আগে সকালে বিকালে একটু জলখাবার খেতাম। সেটা বন্ধ হয়ে গেল। মা পিসীমা দিদিরা আগে সেমিজ গায়ে দিতেন। তাও বন্ধ হয়ে গেল।

বাবা আমাদের আরও অসহায় করে রেখে গেছিলেন। আমাদের জমিদার জ্ঞাতির ছাগলটি আমাদের বাড়ীতে ঢুকে শাকসব্জী খেয়ে ফেলছিল। টম দেখতে পেয়ে আচ্ছা ক'রে কামড়াচ্ছিল তাকে। আমরা টের পাওয়া মাত্র ছাগলটাকে ঘায়ে ওষুধ দিয়ে তাদের বাড়ী দিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই বহু চাষী মজুর বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলল। প্রজাদের নিয়ে জমিদার এসেছেন টমকে হত্যা করতে। মা পিসীমা আপত্তি করলেন। আমরা ভাইবোনরাও আপত্তি করলাম। কেউ শুনলে না। আমাকে হাত পা বেঁধে একটা গাছের মধ্যে টাংগিয়ে রাখা হ'ল। তারপর সব লোকজন এসে আমাদের ঘরে ঢুকল। তন্ন তন্ন ক'রে ঘর-দোর বাগান জংগল সব তারা খুঁজল কিন্তু টমকে পেল না। দরিদ্র প্রতিবেশীরা কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস করল না।

আমাদের নিঃস্ব দরিদ্র পেয়ে কেউ উৎপীড়ন করলে কে আর, এখন রক্ষা করবে? সরকার তো শুধু বড়লোকদেরই কথা শোনে। যে মরে গেছে তাকে কি আর কোনো রকমেই আনা যায় না ফিরিয়ে? ভগবান হয়তো পারেন, কিন্তু কোথায় ভগবান? সবকিছুই যদি ভগবান করেন তাহলে কেন তিনি মিছেমিছি কষ্টে ফেলেন নিরপরাধকে? কোনদিন কারও অনিষ্ট তো কামনা করি নি আমি।

বাজারের পথে দেখা হ'ল নিতাইর সংগে। এই মাত্র তার দিদির বাড়ী থেকে ফিরে এল সে। আমাকে দেখে খুব উল্লসিত হয়ে কাছে এল। কিন্তু পরক্ষণেই বিমর্ষ মুখে বলল, তোর বাবা তোকে খুব মেরেছে, না রে? বাবার কথা শুনে কান্নায় গলা বুজে এল আমার। অনেক কষ্টে বললাম, না। সে জিগগেস করল, তোর বইখাতা কেনা হয়ে গেছে, পড়া শুরু করেছিস্? আমি বললাম, না। বাবার চিতার পাশ দিয়ে যেতেই সে আমার মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে, আমাদের বাড়ীর দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলল আমার বাবা আর নেই। কেমন যেন হয়ে গেল সে। এত বিহ্বলতা, এত উদ্বেগ ইতিপূর্বে আর কখনও দেখা যায়নি তার মধ্যে।

আমার বাবা আমাকে নিতাইর সংগে মিশতে দিতেন না বলে নিতাইও আমার বাবাকে দেখতে পারত না। তবু তাঁর মৃত্যুর কথা শুনে সে শোকে মুহ্যমান হয়ে গেল। আমার মা'র প্রতি নিতাইর কৃতজ্ঞতার আর অন্ত ছিল না। তার কাছে আমার মা-ই ছিলেন সব চেয়ে ভাল মেয়েমানুষ। মা'র ক্লেশের কথা ভাবতেও

পারত না সে। তারওপর আমার পড়া হবে না একথা যে নিতাইর কাছে শেলের মতো।

কয়েকদিন পর্যন্ত আর নিতাইর কোনো হদিস মিলল না। হেটে হেটে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে, বিষ্টিতে ভিজে রোদে পুড়ে আমার জন্য অল্প পয়সায় বা বিনেপয়সায় বই যোগাড় করতে লাগল। সে ফেল করেছে, তার মামা আর তাকে পড়াবেন না। তার নিজের বই কেনার কোনো বালাইও ছিল না।

আমার জন্য অনেক নূতন বই ও খাতা নিয়ে একদিন নিতাই এসে হাজির হ'ল। আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। বললাম, টাকা পেলে কোথায়, নিতাই ?

—পেয়েছি কোথাও।

—বল না কোথায় পেলে।

নিতাই বলল, আমার দিদির বাড়ীর কাছে একটা খুব বড়লোক জমিদার আছে। আমি তাদের পুকুরে স্নান করছিলাম। তখন জমিদারগিন্নীও এল স্নান করতে। সে তার হারটা ঘাটে রেখে পুকুরে নেমে ডুব দিতেই আমি সেটাকে নিয়ে জলের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম। পরে হারের খোঁজ পড়ল। অন্য কোথাও পাওয়া গেল না দেখে সবাই ঠিক করল জলেই হারিয়ে গেছে। গিন্নী বলল, যে বার করতে পারবে তাকে আমি কুড়ি টাকা পুরস্কার দেব। বহু লোক জলে নেমে খুঁজতে লাগল। সবার সংগে আমিও খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে আমিই পেলাম।

রাগে ভয়ে ঘেন্নায় আমার মনটা ভরে গেল। বললাম, ছোটলোকের মতো ঠকিয়ে টাকা আনলে তুমি। বিস্মিত হয়ে

নিতাই বলল, বড়লোকদের ঠকালে ছোটলোক হয়, আর ছোটলোকদের ঠকালে বড়লোক হয়? আমি বললাম, মাকে কী বলব আমি? নিতাই রেগে বলল, বলবি বইগুলি নিতাইর। বাস্ চুকে গেল। ব্যাটারা দোকান দেবে, বেশী দাম নেবে, মাপে কম দেবে, তারপর বড়লোক হয়ে অন্যের বাড়ী চড়াও হবে। শালাদের ঠকাব, একশবার ঠকাব, হাজার বার ঠকাব।

আমি গিয়ে বইগুলি টেবিলের উপর গুছিয়ে রেখেছি এমনসময় মা জিগগেস করলেন, বই পেলি কোথায়?

—নিতাইর বই।

—নিতাই তো ফেল করেছে, সে বই দিয়ে কী করবে?

—আমার জন্য এনেছে।

—টাকা পেল কোথায়?

আমি আর কোন জবাব দিতে পারলাম না। চোর ও লোভী নিতাই যে কীভাবে টাকা যোগাড় করবে এটা সবাই জানত। মাও বুঝতে পারলেন। বললেন, এক্ষণি ফিরিয়ে দিয়ে আয় নিতাইর বই নিতাইকে। নিতাইর কত স্বপ্ন জড়িত আছে এ বইকখানার মধ্যে — আমি প্রথম হব, বৃত্তি পাব, এম. এ. পাশ করব, আরও কত কী। কী ক'রে আমি ফিরিয়ে দেব? আমাকে দেরী করতে দেখে মেজদি গিয়ে বইগুলি নিতাইর কাছে ফেলে দিলেন। হতবাক হয়ে নিতাই চেয়ে রইল বইগুলির দিকে। সে অপ্রতিভ হতাশাপূর্ণ বেদনার্ত মুখখানি আমি আর ভুলব না এ জীবনে। আমি তাকে বললাম, মা কিছুতেই এ বই রাখতে দেবেন না ঘরে। শুনে সে অসহায়ভাবে আমার

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে খানিকক্ষণ কি চিন্তা করল। তারপর একটিও কথা না বলে বেরিয়ে গেল আমাদের বাড়ী থেকে। অন্তরের নিভৃতে কে যেন আমাকে বারে বারে বলল, ভাল না, ভাল না। ভালবাসাই সুখের ভিত্তি, ভালবাসার পরশ যেখানে বিদ্যমান সেখানে সংশয় দ্বিধা, যুক্তি তর্ক সবই অর্থহীন। সকল সংশয় সকল সংস্কার মুহূর্তে ত্যাগ ক'রে সড়াসড়ি বুকে তুলে না নিলে ভালবাসাকে পাওয়া যায় না। ভালবাসা গণ্ডুষের জল। যে যত দ্রুত পান করবে সে তত বেশী পরিমাণে লাভ করবে। বেশী বিচার করতে গেলে আংগুলের ফাঁক দিয়ে সব জল গড়িয়ে পড়ে যাবে।

তবু সাহস করলাম না কিছু বলতে। আমার বুদ্ধিও বলল, ঠিকই করলাম, চোরকে বর্জন করে ভালই করলাম। নিতাই বুঝে গেল অন্য সকলের সংগে আমিও তার বিরুদ্ধে। কিন্তু কেন এই ব্যবধান — আপনার সংগে আপনার, সত্যের সংগে আবরণের?

নূতন বছরে একটা নবীন উৎসাহ নিয়ে উপরের ক্লাশে বসলাম। মনে হ'ল আমি যেন মনের দিক দিয়েও অনেকটা উপরে উঠে গেছি, সব কাজেই একটু বেশী দায়িত্ব অনুভব করছি। অনেকদিন পর আবার খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করতে লাগলাম। বড়মানুষ হওয়ার কত নূতন স্বপ্নে মন ভরপূর হয়ে উঠল। আমার কাঁধ থেকে স্বদেশী ঘর-ছাড়ানো ভূতটা চলে যাওয়াতে গ্রামবাসীরাও আনন্দিত হলেন। নিতাইর দেওয়া বইগুলি সে চলে যাওয়ার পর আমি লুকিয়ে তুলে রেখে দিয়েছিলাম, আজকাল তার সদ্‌ব্যবহার করতে লাগলাম।

অন্তর ও বাহির

স্কুলের বেতন দিতে না পারার অপরাধে হঠাৎ একদিন আমার স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেল। স্কুল-পালানো ছেলেদের মধ্যে আমি ছিলাম সবার সেরা। কোনোমতে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলেই বাঁচতাম। কতদিন স্কুলে না গিয়ে লুকিয়ে জংগলে বা পাটখেতে বসে বসে গল্পের বই পড়তাম। বর্ষাকালে ইচ্ছে করে নৌকা থেকে জলে পড়ে গিয়ে ছুটি নিয়ে আসতাম। সেই আমিই আজ স্কুলে যেতে না পারায় মন-মরা হয়ে গেলাম। সবাই যায় আমি যেতে পারি নে-ভাবতেও দুঃসহ জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতাম। নিজ থেকে করতে যে-কাজে আনন্দ পাই, বাধ্য হয়ে করতে সে-কাজটাতেই কেন বেদনা পাই ? পরাধীনতার প্রাসাদ ছেড়ে মানুষ কেন বরণ করে স্বাধীনতার কুঁড়ে ঘর ? এর কোনো অর্থ খুঁজে পাই নে কেন জড়বাদী চিন্তা দিয়ে ?

আমার পড়া পড়া ক'রে মা'র আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। সংসারের কোনো কিছুর উপরই তাঁর লোভ নেই, শুধু চান লেখাপড়া। আমি ভাল ছাত্র বলে ফ্রী পড়ার অনুমতি চেয়ে সেক্রেটারীর কাছে দরখাস্ত করে জবাব পেলেন আমার মতো দুর্দান্ত প্রকৃতির ছেলেকে দশজনের পয়সায় পড়ানো চলে না। অবশেষে প্রতিবেশীরা সবাই মিলে অনেক চেষ্টা চরিত্র ক'রে স্কুলে যাওয়ার অনুমতি ক'রে দিলেন। আশায় আনন্দে পুলকিত হয়ে গিয়ে আমি স্কুলে বসলাম। কিন্তু এ পুলকও আমার বেশীদিন টিকল না। একটা দুর্বিষহ করুণার বোঝা চেপে ধরল আমাকে। কেবলি মনে হতে লাগল আমি সবার দয়ার পাত্র। তবু মায়ের ভয়ে নিয়মিত স্কুলে যেতে লাগলাম।

একদিন দেখলাম বিরাট একটা শোভাযাত্রা মাঠ দিয়ে আমাদের স্কুলের দিকে আসছে। স্কুলের দরজার কাছে এসে সবাই চীৎকার করতে আরম্ভ করল—বন্দেমাতরম্, আল্লা হো আকবর, মহাত্মা গান্ধী কী জয়, দেশবন্ধু দাশ কী জয়, বিপিন পাল কী জয়, লজপত রায় কী জয়, মতিলাল নেহরু কী জয়। স্কুলের মধ্যে একটা রব উঠল—গোলামখানা ছাড়, গোলামখানা ছাড়। বড় ছাত্ররা বেরিয়ে পড়ল, সংগে সংগে ছোটরাও বেরিয়ে পড়ল। স্বাধীনতা আন্দোলন গ্রামেও শুরু হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেল নানা জায়গার হাইস্কুলগুলি। ছাত্রদের প্রধান কাজ হ'ল নানা জায়গায় মিটিং ক'রে বিলাতী কাপড় জামা পোড়ানো, পিকেটিং ক'রে মদগাঁজার দোকান বন্ধ করানো, এবং অবসর সময়ে বড় বড় নেতাদের যশ ঐশ্বর্য সম্বন্ধে নানারকম কাহিনী রটনা ক'রে লোকের মন মাতানো। এরকম অবস্থায় ছাত্রদের শিক্ষার জন্য নানা জায়গায় কতগুলি ন্যাশনেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'ল। সামন্তপুরেও একটি হ'ল। অন্যান্যদের সংগে আমিও গিয়ে সেখানে ভর্তি হলাম। বেশ মজা ছিল সেখানে। পাছে ছাত্ররা হাইস্কুলে চলে যায় এ ভয়ে পড়া বা বেতন আদায় করার জন্য শিক্ষকরা বেশী চাপ দিতেন না।

সামন্তপুর ন্যাশনেল স্কুল শিগগিরই বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যাশনেল স্কুল বলে পরিগণিত হ'ল। সামন্তপুর কংগ্রেস শিবিরও ছিল তার সংগে, সেটিও বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিবির রূপে পরিচিত হ'ল। ন্যাশনেল স্কুলের শিক্ষকরাই ছিলেন কংগ্রেস শিবিরের নেতা। এখান থেকেই তাঁরা পরিচালনা করতেন স্থানীয় সর্বপ্রকার

স্বদেশী ও সমাজসেবী আন্দোলন। তাঁদের সংগে থেকে আমরাও উপলব্ধি করলাম জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আনন্দ, সমাজজীবনের সমষ্টিগত অখণ্ড আনন্দ। ব্যক্তিজীবনের খণ্ড আনন্দের ভিতর দিয়েই পৌঁছতে হয় সমাজজীবনের অখণ্ড আনন্দে। প্রতিটি কর্তব্যের শেষ পরীক্ষা হবে তার দ্বারা সমাজের কতটুকু আনন্দ বৃদ্ধি পেল সে মানদণ্ড দিয়ে। একটা কাজ করলে যদি আমার একটু সুখ নষ্ট হয় কিন্তু আরেকজনের লাভ হয় অনেকখানি বেশী সুখ, তাহলে সে কাজটা আমার সর্বতোভাবে করা উচিত। এভাবে চললে শেষ পর্যন্ত আমার আনন্দই বাড়বে সবচেয়ে বেশী, বিশ্ববিধানের এমনি বিচিত্র ব্যবস্থা। সব কয়জন শিক্ষক নেতাই ছিলেন একটা সুমহান আদর্শ, বিপুল জ্ঞান, অমিত শক্তি ও সবল চরিত্রের অধিকারী। আগে আমি অবাক হয়ে ভাবতাম দেশের উচ্ছৃংখল লোকরাও কিক'রে জীবন মরণকে তুচ্ছ ক'রে একটা মহৎ আদর্শের সাধনায় অবলীলাক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে চরম বিপদের মুখে। এখানে এসে নেতাদের সংগে মিশে সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করলাম। কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রমূলে অল্প কয়েকজন চরিত্রবান ও নিষ্ঠাসম্পন্ন লোক থাকলেই অতি সাধারণ লোকরাও অপ্রত্যাশিতভাবে বহু মহৎ কর্ম সুসম্পন্ন ক'রে সে প্রতিষ্ঠানের কর্মধারাকে মহীয়ান করে তোলে। কেন্দ্রশক্তিই যে প্রধান শক্তি বিজ্ঞানের এই তথ্যকে পূর্ণভাবে হৃদয়ংগম করলাম। যাকে আমরা নেতৃত্বের প্রতিভা বলি সেটাও তো কেন্দ্রশক্তি সৃজন ও বিতরণ বই আর কিছুই নয়। গ্রহণ ও সমর্পণ এ দুটোই মানুষের ধর্ম। তার স্বভাবের একটা দিক সক্রিয়, একটা দিক নিষ্ক্রিয়।

একদিকে সে যেমন চায় স্বাবলম্বী হয়ে নিজে পরিচালনা করতে, অপরদিকে সে তেমনি চায় আত্মসমর্পণ ক'রে কোনো কেন্দ্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত হতে। কেন্দ্রশক্তি দ্বারা পরিচালিত না হলে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বাস করতে পারে না। প্রকৃষ্ট নেতার কাজ—বিজ্ঞান ও যুক্তিরাজ্যের বহু ঊর্ধ্বে প্রেমের রাজ্যে বিচরণ ক'রে সেখান থেকে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা আহরণ করা, তারপর নিজের মধ্যে কেন্দ্রশক্তি সৃষ্টি ক'রে বিজ্ঞান ও যুক্তি দ্বারা তাকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রয়োগ করা।

স্বদেশী আন্দোলন দেশের ভাল করছিল কি মন্দ করছিল সে বিচার করুন বড়লোকেরা। আমরা শুধু বলতে পারি এমন আর দেখি নি, শুনি নি, ভাবি নি। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ, অনির্বচনীয় শক্তি, অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস এসে কর্মোন্মুখ করে তুলল আমাদের সবাইকে। একটা নিঃসীম উদারতার আবেশে আত্মহারা হয়ে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে ব্যাকুল হয়ে উঠল সমাজের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে। একটা নব জাগরণের সাড়া পড়ে গেল সমগ্র সমাজটার প্রতি আনাচে কানাচে।

শিক্ষার দিক থেকেও একটা নূতনত্বের সন্ধান পেলাম ন্যাশনেল স্কুলে এসে। হাইস্কুলের শিক্ষার মানদণ্ড ছিল ইংরেজানুকরণ। ইংরেজী লিখতে পারা, ইংরেজী বলতে পারা, ইংরেজকে উন্নত জাতি মনে করা, ভারতকে অসভ্য দেশ মনে করা, ইংরেজী অক্ষর পরিচিত একটা ফিরিংগী পুলিশকে সংস্কৃতজ্ঞ একজন অধ্যাপকের চেয়ে বেশী বিদ্বান মনে করা ইত্যাদি। বাস্তব জীবনের সহিত কোনো সম্পর্ক ছিল না সে শিক্ষার। কিন্তু ন্যাশনেল স্কুলে

শিক্ষার আদর্শ ছিল আত্মবিকাশ, সমাজসেবা, জাতীয় উন্নতি। শুধু মাত্র বই পড়লেই এখানকার শিক্ষা শেষ করা যেত না। চরকা কাটা, তাঁত বোনা, মাটির জিনিস তৈরি করা, কাঠের জিনিস বানানো বিষয়ে রীতিমত পরীক্ষা দিতে হ'ত। এর উপরও প্রত্যেক ছাত্রেরই আবার করতে হত সমাজসেবামূলক কতগুলি সুনির্দিষ্ট কাজ।

অনেক বিখ্যাত অধ্যাপকরা সরকারী চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরাই আবার গ্রহণ করেছিলেন ন্যাশনেল স্কুলের শিক্ষকতার ভার। আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাঁদের বহুমুখী অতলস্পর্শী পাণ্ডিত্যে। তাঁদের সকলের সারাজীবনের অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার রাতারাতি আয়ত্ত ক'রে ফেলার জন্য আমি প্রাণপণ লেখাপড়া করতে লাগলাম। পাঁচ ছয়খানা দৈনিক, পাঁচ ছয়খানা সাময়িক পত্রিকা নিয়মিত পড়েও অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রামমোহন রায়, পরমহংসদেব, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, মহাত্মাগান্ধী, দেশবন্ধু দাশ, লিংকন, ম্যাটসিনি, গ্যারিব্যাল্ডি, লেনিন, সানুইয়াৎসেন, ভিভ্যালৈরা, কামালপাশা, প্রভৃতি বহু বড়মানুষের জীবনী পড়ে শেষ করে ফেললাম। শিক্ষক ছাত্র নির্বিশেষে সকলে আমাকে বলত এনসাইক্লোপেডিয়া।

কিন্তু এক শ্রেনীর উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং ইংরেজঘেঁষা লোক আপদ জ্ঞানে সর্বদাই বিব্রত করতে চাইতেন আমাদের। কবে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্ণ অবসান ঘটবে এটাই ছিল তাঁদের মুখ্য চিন্তা। একদিন একটা জনসভার সংবাদ প্রচার

করছিলাম বাড়ী বাড়ী ঘু'রে। বিয়ে উপলক্ষে অনেক বিলাত ফেরতা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট সমবেত হয়েছিলেন জমিদার বাড়ীতে। জজসাহেব আমাকে বললেন, তোমরা কি সত্যি ইংরেজকে তাড়াবে না কি খোকা? আমি বললাম, না তাড়ালে দেশ স্বাধীন হবে কী ক'রে? তিনি বললেন, তখন দেশ শাসন করবে কে?

—আমরাই করব।

—কীক'রে পারবে?

—যা করে পারে ইংরেজ জার্মান ফরাসী আমেরিকা রাশিয়া।

—কিন্তু ইংরেজরা যে টেলিগ্রাম রেলগাড়ি জাহাজ দিয়েছে?

—টাকাও নিয়েছে তার জন্য প্রচুর।

—ইংরেজ না এলে তো তোমরা টাকা দিয়েও পেতে না এসব।

—ইংরেজকে চতুঃসীমানার মধ্যে ঢুকতে না দিয়েও জাপান করেছে এসব সেকথা আমাদের ভুললে চলবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব বললেন, বাইরের থেকে যদি আমাদের দেশকে আক্রমণ করে তখন রক্ষা করবে কে?

আমি বললাম এতকাল যাবত্‌ যারা রক্ষা করে আসছে তারাই করবে।

—তার মানে?

—আমাদের দেশের বেশীর ভাগ সৈন্যই তো হচ্ছে এ দেশের, ইংরেজ সৈন্য তো সে তুলনায় সামান্য।

এক বৃদ্ধ ব্যারিষ্টার বললেন, দেখ বাবা, তোমাদের বাপ ঠাঁকুর্দা যে-কাজ করতে সাহস করেন নি, তোমাদের কি উচিত সে কাজ করা?

আমি বললাম, আপনার বাপ ঠাকুর্দাও তো ব্যারিষ্টারী করেন নি।

অপ্রস্তুত হয়ে তিনি বললেন, হাইস্কুলে পড়লে তো রত্ন হতে পারতে। ইংরেজ অফিসার মিষ্টার পেডি পর্যন্ত তোমার শিক্ষার প্রশংসা করছিলেন।

জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট দুজনেই চমকে উঠে বললেন, এ্যাঃ!

আমি বললাম, ন্যাশনেল স্কুলেই তো পেয়েছি সে শিক্ষা।

ব্যারিষ্টার বললেন, দুকথা ইংরেজী না বলতে পারলে সে শিক্ষার দাম কী?

আমি বললাম, ইংরেজ বলে তার মাতৃভাষা, আমরা বলব আমাদের মাতৃভাষা।

তিনি বললেন, দেখো বাবা, দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের গভর্ণমেণ্ট বড় চাকরি দেবে ইংরেজী-জানাদেরই।

বাড়ী ফিরে মাকে বললাম সব কথা। সারাদিনের বীরত্বকাহিনী মাকে ব'লে কিযে আনন্দ পেতাম। সকল দুঃখ কষ্ট যেন হয়ে উঠত সার্থক।

কিন্তু একটানা সুখ আমার বেশী দিন সয় না। বিপদ এসে জুটবেই কোথাও থেকে। সবাই বলত আমার হৃদয় পাষাণে গড়া, দয়া-মায়ার লেশমাত্রও নেই। অদৃষ্ট দোষে সে পাষাণেও ধরল ফাটল।

আমের দিন আসে, চলে যায়। লিচুর দিন আসে, চলে যায়। লেবুর দিন আসে, চলে যায়। বাজার দোকান সব ফলে ভরে যায়, সবাই কিনে নিয়ে খায়। পূজা পার্বন আসে

ঘরে ঘরে। আমাদের দরিদ্র ঘরে আসে না আম লিচু লেবু পুজা পার্বন কিছুই। বড় কষ্ট হয় ছোটভাই অধীরের জন্য। এমন নির্লোভ শান্ত সংযত ভাল ছেলে, মনে শত ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে বলে না কাউকে কিছু। শুধু বড় বড় চোখ দুটি চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবে। আমাদের বাগানের আম জমিদার নিয়ে বিক্রী করে। নেবার সময় কাঁটা-ঝোপের মধ্যে দুএকটা আম পড়ে থাকে, অধীর হাত-পা কেটে ছিঁড়ে রক্তাক্ত হয়ে তা কুড়িয়ে আনে। ব্যাপারীদের আম লেবুর নৌকাগুলি নদীতে থাকে। পচা আধপচা ফলগুলি তারা জলে ফেলে দেয়। অধীর সে অথই জল থেকে কত কষ্টে খোঁজাখুঁজি করে দুএকটা আধো-ভাল আম বা লেবু নিয়ে আসে। নিজে না খেয়ে দিদিদের হাতে দেয়। জল আসে দিদিদের চোখে।

একদিন কংগ্রেসের একটা কাজে নদীর ওপারে যেতে হ'ল। নৌকা ছিল না ব'লে সাঁতরিয়ে পার হলাম। খেয়ার যে চারটে পয়সা বেঁচে গেল তা দিয়ে ফেরার সময় আম নিয়ে এলাম অধীরের জন্য।

মা বললেন, পয়সা পেলি কোথায়? আমি বললাম, খেয়ার পয়সা লাগে নি, সাঁতরিয়ে পার হয়েছিলাম। ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি বললেন, পয়সা চুরি করেছিস? আমি বললাম, কংগ্রেস তো আমাকে পয়সা দিয়েছিল নদী পার হতে। আরও ক্রুদ্ধ হয়ে মা বললেন, খেয়ার মাঝিকে দিতে দিয়েছিল, লেবু কিনতে নয়।

পরদিন মা ন্যাশনেল স্কুলের বোর্ডিং সেবকসদনে আমার থাকার ব্যবস্থা করলেন চরিত্র সংশোধনের জন্য।

নয়

সেবকসদনে এসে যে-ছেলেটির সংগে আমার সবচেয়ে বেশী ভাব হ'ল তার নাম কল্যাণ। আমার চেয়ে বয়সে ছোট, পড়তও দুই ক্লাশ নীচে। সবকিছুই তার ছিল আমার বিপরীত। আমি যেমন কালো জোয়ান উগ্র, সে তেমনই ফর্সা দুর্বল শান্ত। আমি সবার মনে স্থান নিতাম জোর ক'রে, আর তাকে সবাই ভালবাসত স্নিগ্ধ কমনীয়তায় মুগ্ধ হয়ে। আমার সংগে কেউ অন্যায় করলে অমনি তার তীব্র প্রতিবাদ করতাম, আর মানুষের অনিবার্য শুভবুদ্ধির উপর একান্ত নির্ভর নিয়ে সে নীরবে সহ্য করত সব অন্যায়। আমার জুলুম মানুষকে অন্যায়ের প্রতি আরও জেদী করে তুলত, আর তার বিনয়ে মানুষের ক্রুদ্ধ সংকল্পও হয়ে যেত স্নেহসিক্ত। তবু আমাদের বন্ধুত্বের বিঘ্ন ঘটত না, কল্যাণের জীবনের জলন্ত আদর্শ ছিল যে তার সমীরদা।

কোন্ সুদূর গ্রামের এক দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান কল্যাণ। স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবকরূপে ঘুর পাক খেতে খেতে সামন্তপুরে এসে ঠেকেছে। এখানকার নেতা কর্মী সবারই সে খুব প্রিয়। নিতাই অন্যায় ও অভদ্রতার প্রতীক, আর কল্যাণ ন্যায় ও বিনয়ের প্রতীক। আমাদের বাড়ী আমার পক্ষে নিষেধ ছিল। কোনোও প্রয়োজন হলে

কল্যাণই যেত। ফলে আমাদের বাড়ীর সবারও একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে গেল সে। অধীর হয়ে উঠল তার একান্ত ভক্ত শিষ্য।

কংগ্রেস-শিবির, ন্যাশনেলস্কুল ও হেডমাষ্টারের বাড়ীর সংলগ্ন অবস্থিত ছিল আমাদের আশ্রম সেবকসদন। জগদীশ চন্দ্র রায় নামক একজন অধ্যাপক নেতার সংগে আমরা কয়েকজন ছাত্র কর্মী আশ্রমের কঠোর জীবন যাপন করতাম এখানে থেকে। বিবাহিত হয়েও কর্মীদের শিক্ষার জন্য জগদীশদা তাদের সংগে সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। আমার বড়দার সহপাঠী ছিলেন ব'লে তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন।

একদিন খবর এল আমাদের বাজারে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। এতকাল পুলিশ পিকেটিংকারী ভলাণ্টিয়ারদের গ্রেপ্তার করে নিত, কিন্তু এখন ভীষণ প্রহার করতে শুরু করেছে। তারওপর গাঁজাখোররা অধিকাংশই অতিশয় বর্বর ও দুর্ধর্ষ, দ্বিধা করে না অহিংস ভলাণ্টিয়ারদের কোনরূপ মারাত্মক আঘাত করতে। কয়েকজন ভলাণ্টিয়ার এখনও হাসপাতালে আছে। তাই ছেলেরা সব ইতঃস্তত করছে পিকেটিং করতে যেতে। আমার মনে হ'ল ভয় পেয়ে পিকেটিং বন্ধ রাখলে সমস্ত ভারতবাসীর মাথা নিচু হয়ে যাবে ইংরেজের কাছে। যদিও আমার পিকেটিং করার পালা ছিল দুদিন পরে, আমি গিয়ে হেডমাষ্টারের কাছে অনুমতি চাইলাম আজই পিকেটিংএ যেতে। কল্যাণও এসে আমার পাশে দাঁড়াল, সংগে সংগে অন্য ছেলেরাও এসে পড়ল।

পনেরজন স্বেচ্ছাসেবকের একটি দলসহ কুচকাওয়াজ করতে

করতে চললাম বাজারের দিকে। জাতীয় পতাকা কাঁধে আমি সবার আগে, জাতীয় সংগীত গাইতে গাইতে পেছনে অন্য সবাই। পতাকাবাহী অধিনায়ক হিসাবে পথিকজনের সস্নেহ আশিস ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আমারই উপর বর্ষিত হওয়াতে বুকটা আমার ফুলে উঠল গর্ব ও পুলকে। সংগে সংগে আবার ভয়ও হল যে সম্মানের আধার জাতীয়পতাকাটাই হবে গুণ্ডা ও পুলিশের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। আসন্ন বিপদের বীভৎস ছবিগুলি মনে ভেসে যেন আড়ষ্ট ক'রে ফেলতে চাইল আমার কর্মশক্তিকে। আমার বাহির ও অন্তরের এই ক্লেশকর দ্বন্দ্বের অবসান করল কল্যাণ। বলল, দাও না সমীরদা, পতাকাটা একটু আমার হাতে, এত বড় ভারি বোঝাটা একা একা কতক্ষণ বইবে তুমি। দিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম আমি।

কল্যাণকে আমি খুব ভালবাসি এটা সবাই জানত। তাই ব'লে এত বড় সম্মানের জিনিসটা এক কথায় তাকে দিয়ে দেব তা কেউ ভাবে নি। ভয় ব'লে একটা জিনিস আমার মধ্যে কেউ কল্পনাও করতে পারে না তাই আমার সুমহান বন্ধুপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে গেল সবাই। কল্যাণের মনটিও যেন আনত হয়ে গেল কৃতজ্ঞতায়।

সকল বিপদের বার্তা জেনে শুনে কল্যাণ কোথায় পেল পতাকা নেবার এই সাহস? মানুষের 'আমি'র দুটা দিক আছে। একটা সূক্ষ্ম ও চিরস্থায়ী, অপরটা স্থূল ও নশ্বর। মানুষের চাহিদারও আছে দুটি শ্রেণী। কতগুলি সূক্ষ্ম ও স্থায়ী, যেমন সততা সরলতা সহানুভূতি সাহস। আর কতগুলি হচ্ছে স্থূল ও

নশ্বর, যেমন আহার নিদ্রা প্রমোদ বিলাস। মানুষ সাধারণতঃ স্থূল চাহিদা মেটাতেই চেষ্টা করে বেশী, কিন্তু তৃপ্তি পায় না। কারণ তৃপ্তির উৎসই হচ্ছে অভীষ্টের জন্য ধন-প্রাণ-মন সর্বস্ব-পণ প্রচেষ্টার মধ্যে। স্থূল চাহিদার জন্য কেউ পারে না ধন-প্রাণ-মন পণ করতে যেহেতু ধন-প্রাণ-মনই যে হচ্ছে স্থূল চাহিদার মূল। সূক্ষ্ম চাহিদা মেটাতে মানুষ ধন-প্রাণ-মন সর্বস্ব-পণ প্রচেষ্টা করতে পারে, কারণ ধন-প্রাণ-মন হারিয়ে গেলেও সূক্ষ্ম তৃপ্তি নষ্ট হয় না। তাই সত্যপূজা, সমাজসেবা প্রভৃতি যেসব কাজের সহিত সূক্ষ্ম চাহিদার সংযোগ আছে তার জন্য মানুষ বিসর্জন দেয় সর্বস্ব, তৃপ্তিও পায়। অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা সমর্থন যে-কাজে পাওয়া যায় তা করতে মানুষের ভয় করে না। তানাহলেই ভয়ের কথা ওঠে, আর একবার উঠলে তাকে খণ্ডানো যায় না যুক্তি দিয়ে। পিকেটিং ক'রে স্বাধীনতা আসবে আমি বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু কল্যাণ তা বিশ্বাস করত সর্বান্তঃকরণে। তাই আমার ভয় করলেও কল্যাণের ভয় করল না।

কিন্তু সত্যি কি আমি নিজের নিশ্চিত বিপদ পরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার মতো নীচমনা ছিলাম? আমার পরিষ্কার মনে পড়ে ছোটবেলায় অতিশয় সংকীর্ণ ছিল আমার মনটা। বাবা চাকরির জায়গা থেকে কোনো ভাল খাবার জিনিস পাঠালে মা সেসব সমান ভাগ ক'রে আমাদের সংগে আমাদের খুড়তুতো ভাইবোনদেরও দিতেন, আমার তা ভাল লাগত না একেবারেই। তাই ব'লে আমি বিপদের মুখে অন্যকে রেখে নিজে পালাতাম না কখনও।

আমি গা বাঁচাব আর কল্যাণ বিপদ বরণ করবে একথা মনে হতেই আমি আবার কল্যাণের হাত থেকে টেনে নিলাম পতাকাটা। এমনসময় পথের ধারে একটা পুকুরপাড় থেকে আনন্দঠাকুরাণী ডাক দিল "কল্যাণ"। আনন্দঠাকুরাণী তার গাইটাকে স্নান করাতে আপ্রাণ চেষ্টা ক'রেও না পেরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, কপাল বেয়ে তার ঘাম ঝরছিল। বলল, আমার গাইটাকে একটু নাইয়ে দেও দেখি বাপু। কল্যাণ বলল, আমার যে এখন সময় নেই মাসীমা। উষ্ণ হয়ে আনন্দঠাকুরাণী বললেন, তোমরা কংগ্রেসের লোক, সময় নাই কিরকম! নাইয়ে দেও বলছি। একদিন আনন্দঠাকুরাণী কংগ্রেসের মুষ্টিভিক্ষার হাড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন, তাই কল্যাণ যেতে উদ্যত হতেই আমি তাকে বললাম, যেয়ো না কল্যাণ। কল্যাণের চোখদুটি ছল্‌ছল্‌ করে উঠল, বলল, ওদের যে কেউ নেই সমীরদা। অবিলম্বে কাজ সমাধা ক'রে ফিরে এল কল্যাণ।

গাঁজার দোকান খোলার আগেই আমরা গিয়ে তার সমুখ পেছন দুদিকের দরজা বেশ ক'রে আগলিয়ে বসলাম। একটি দুটি ক'রে গাঁজাখোরেরা এসে জমতে লাগল। ঠোট কালো, চোখ লাল, দেখলেই যেন ভয় করে। হাতেম কুলু এসে বলল, হিন্দু হইয়া আপনারা দেবতার লগে শত্রুতা করেন, মহাদেবের পূজা কি গাঁজা ছাড়া হয়? এক রক্তকপাল কালীভক্ত হাতে ছোরা নিয়ে এসে বলল, পথ ছাড়্‌, পথ ছাড়্‌, নইলে রক্ষা থাকবে না কারও। আরেকজন এসে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলল "পথ কি তোর বাবার না-কি রে শালা, যে ছেড়ে দেবে?

গাঁজা, না খেয়ে তোদের বাপের মাথা খেতে পারিস নে শালা গাঁজাখোরেরা !" তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, "বাবুরা রাগ করবেন না, আপনাদের গান্ধীরাজার নগভলেন্সের কম্ম নয়। এ শালাদের লাঠি-পেটা করতে হবে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর না হলে কি চলে বাবুরা। আর এই দোকানদার ব্যাটা, এই ব্যাটা দোকানটা বন্ধ ক'রে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন।" বলতে বলতে সে মারমুখী হয়ে দোকানের ভিতরে চলে গেল। অহিংসপন্থী হলেও আমরা বেশ খুশী হলাম অচেনা লোকের মধ্যে এতবড় একজন সমর্থক পেয়ে। লোকটা সত্যি ক্ষমতাপন্ন, নইলে এতগুলি গাঁজাখোর গুণ্ডা তাকে কেন ভয় করবে !

এক গাঁজাখোর এসে বলল, আমার পরিবারের বড় অসুখ, গাঁজা দিয়া ওষুধ বানাতে হবে। আরেকজন বলল, আমার বাড়ীতে ত্রিনাথের মেলা, গাঁজা না পেলে শিবের কোপে আমার বংশ নিব্বংশ হবে। আবার আরেকজন বলল, আপনারা ভদ্রলোক, আপনারা ক্যান্ মাটিতে বইসা কষ্ট করছেন, আমরা বইসা পিকেটিং করি, কোনো শালা গাঁজাখোর ঢুকতে পারবে না। এভাবে গাঁজাখোররা দোকানে ঢোকার নানা ফন্দী খাটাতে লাগল। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে সকল গাঁজাখোরই তাদের আসক্তির জন্য বিশেষ লজ্জিত, শুধু প্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে না ব'লেই নেশা করে। আমাদের অনুরোধ তারা রাখতে চায় কিন্তু পারে না। প্রথম ভাবলাম তাদের দোষ। পরে মনে হ'ল আমাদেরই ত্রুটি। বাহ্যিক প্রবৃত্তির ভিত্তিমূলে যে আন্তরিক

প্রেরণাপীঠ আছে যতক্ষণ দোলা না লাগবে তার মধ্যে ততক্ষণ বাহ্যিক প্রবৃত্তিগুলি থাকবে অনড় হয়েই। আমাদের যুক্তিগুলি পড়ে থাকে নেশাখোরদের বাহ্যিক স্তরে। এমন আত্মিক শক্তি সম্পন্ন লোক আমাদের মধ্যে কেউ নেই যে দোলা দেবে তাদের অন্তরের প্রেরণাপীঠকে। বড়দার মতো বিপুল জ্ঞান বা গভীর সাধনা তো আমাদের নেই।

অবশেষে এল বিখ্যাত গাঁজাখোর, গুণ্ডার সর্দার, রুক্ষকেশী কর্কশভাষী ক্রুদ্ধস্বভাব লালু। বিরাট জোয়ান নির্মম হিংস্র লোকটা কোপিত নয়নে বাবরি দোলাতে দোলাতে হন্‌হন্ করে তেড়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। ভয়ে বুক কাঁপতে লাগল সব ভলান্টিয়ারদের। গাঁজাখোরগুলিও তার কীর্তি দেখার জন্য চেয়ে রইল উদ্‌গ্রীব হয়ে। ইতিপূর্বে লালুকে দেখি নি, শুধু শুনেছিলাম এতবড় ডাকাত আর নেই। ভয়ে যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। সে সোজা আমার কাছে এসে বলল, বাবু আমার বাড়ীতে রোজ একটাকার চাউল লাগে। সারাদিন পরিশ্রম কইরা আমি মাত্র আট আনা রোজগার করতে পারি। কিন্তু গ্যাঁজা খাইলে একটাকা রোজগার করতে পারি। তবে আপনারা ভদ্রলোক হইয়া আমাগ ভোগে কাঁটা দিতে আসেন ক্যান্?

একজন আমার কানের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল লালুর পরিচয়। লালুর বাবা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ, মা ছিলেন করুণার প্রতীক। অল্প বয়সে বাবা মা হারিয়ে লালু অগাধ সম্পত্তি ও প্রাসাদোপম অট্টালিকার মালিক হয়ে বসে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দান-ধ্যান ক'রে এবং বন্ধু-স্বজনদের কাছে ঠকে সর্বস্ব

খুইয়ে হয়ে যায় পথাশ্রয়ী দরিদ্র। বিপত্নীক নিঃসন্তান লালু এখন ষ্টেশনে মোট বয়, হোটেলে খায়, জেটিতে ঘুমায়। বিধবা ভ্রাতৃবধুর পরিবারটি তাকেই দেখতে হয়। অসময়ে মড়া পোড়াতে বা দুষ্টলোককে জব্দ করতে নাকি এই বদরাগী গাঁজাখোরটার জুড়ি আর নেই। আমি তার শান্ত প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়ে গেলাম। কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারলাম না। শুধু ভাবতে লাগলাম।

অকস্মাৎ আমার তন্ময়তা ভেংগে গেল একদল গাঁজাখোরের অট্টহাসিতে। আমাদের যে সমর্থক প্রবর দোকানে প্রবেশ করেছিলেন দোকানীকে শাসন করতে তিনিই এক ফাঁকে গাঁজা নিয়ে বেরিয়ে এসে তা বিতরণ করছেন বন্ধুদের মধ্যে। আমাদের দিকে বৃদ্ধাংগুষ্ঠ নাচিয়ে নাচিয়ে তারা হাসছে হাঃ হাঃ হাঃ। লালু কিন্তু ঘৃণায় সেদিকে তাকালও না।

একটু পরেই পুলিশ এল পিকেটিং রোধ করতে। চোখের ইশারায় গুণ্ডাগুলিকে লেলিয়ে দিল আমাদের দিকে। মার মার হট্টগোলের মধ্যে নিশ্চল হয়ে বসে মার খেতে লাগলাম আমরা। সে হট্টগোল থামাতে পুলিশও মারতে লাগল আমাদেরই। হঠাৎ হুংকার দিয়ে লালু ঝাঁপিয়ে পড়ল গুণ্ডাদের উপর। ভয়ে পালিয়ে গেল তারা। তারপর পুলিশ আমাদের অনেক মারধর করল, কিন্তু পিকেটিং নষ্ট করতে পারল না। বিকালবেলা প্রহার-জর্জরিত রক্তাপ্লুত দেহে আমরা ফিরে চললাম কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন ক'রে। চতুর্দিকে জয়জয়কার পড়ে গেল আমাদের।

জাতীয় বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই এক বিরাট জনসভা বসেছিল

আমাদের অভ্যর্থনার জন্য। জগদীশদার বিলাত-ফেরতা সুশিক্ষিতা স্ত্রী, হেডমাষ্টারবাবুর বড় কন্যা সুলতাদেবী ছিলেন তার সভানেত্রী। আমরা সেখানে পৌঁছতেই আমাকে বুকে টেনে নিলেন জগদীশদা। কল্যাণ এবং অন্যান্য ভলান্টিয়াররা সবাইকে বলল আজকের সকল কৃতিত্ব তাদের সমীরদার। তখন সকল বক্তাই শুধু আমার প্রশংসা করতে লাগলেন। হেডমাষ্টারবাবুর স্ত্রী বিনতার-মা মহিলাসমিতির পক্ষ থেকে আমার গলায় মালা পরিয়ে, কপালে চন্দন-তিলক এঁকে আমার রক্তাক্ত মাথাটা দেখিয়ে বললেন, আজকের এই রক্তপিচ্ছিল পথেই সাম্রাজ্যবাদের কলংকসৌধকে ভেংগে চুরমার ক'রে আসবে ভারতের মহামানবের মুক্তিরথ। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তাঁর মুখের পানে চেয়ে কেবলি সকরুণ নালিশ জানাতে লাগলাম ভগবানের কাছে—আমার মা পিসীমারা কেন হলেন না বিনতার-মা'র মতো উদার, শিক্ষিত, সাহসী, তেজস্বী ও স্বদেশপ্রেমিক। মায়ের ঐকান্তিক সাত্ত্বিকতাপূর্ণ ধর্মনিষ্ঠা, এমন কি আমাদের হিন্দুধর্মটার উপরও বিমুখ হয়ে গেল আমার মনটা।

সর্বশেষে উঠলেন জগদীশদার অশেষ রূপ-গুণবতী স্ত্রী। সমগ্র জনতা উৎসুক নেত্রে উৎকর্ণ হয়ে রইল তাঁর বাণী শোনার জন্য। ভবিষ্য শ্রেণীসংগ্রামের বৈজ্ঞানিক গতিবিধিটা জলের মতো বোঝাতে গিয়ে তিনি বললেন—শোষিত সর্বহারাদের বুকে চেপে বসে আছে যে ধনিকের দল তাদের আমরা ক্ষমা করব না কোনোমতেই, তারাই সবচেয়ে বড় শত্রু আমাদের। তারপর তাঁর বহুমূল্য মনোরম সিল্কের শাড়ীর আঁচলটাকে কোমড়ে

বেশ ক'রে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, সমীর কল্যাণের মতো ছেলেরা আমাদের সমাজের আদর্শ, সত্যি কথা বলতে কি, কল্যাণের মতো ছেলে আমি জীবনে দেখি নি কখনও। করতালি ধ্বনিতে সমস্ত সভা মুখরিত হয়ে উঠল। আমার মনটাও ভরে উঠল আনন্দে। কিন্তু শুধুই কি আনন্দ?

কল্যাণকে আমিই ভালবাসতাম সবচেয়ে বেশী, আমিই সর্বক্ষণ করতাম তার প্রশংসা। কিন্তু যখনই অন্যের মুখে তার প্রশংসা শুনলাম তখনই আমি নিজে এত প্রশংসা পাওয়া সত্ত্বেও বুকের ভিতরটায় যেন একটা জ্বালা বোধ করলাম। জানি নে কেন এই অদ্ভুত আত্মব্যবধান।

আমি ছিলাম আমাদের ক্লাশে ফার্ষ্ট বয়, কল্যাণ ছিল তাদের ক্লাশে। একবার পরীক্ষার আগে কল্যাণ আমাকে বলল, তুমি যখন শেষরাত্তিরে উঠে পড়তে বস তখন আমাকেও জাগিয়ে দিও, সমীরদা। পরদিন থেকে রোজই শেষরাত্তিরে পড়তে বসার আগে আমি কল্যাণকে ডেকে জাগিয়ে দিতাম। বাস্ ঐ পর্যন্তই। শীতের রাতে কেউ জাগা মাত্রই বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না, ভাল ক'রে জাগিয়ে জোর ক'রে তুলে দিতে হয়। আমি তা করতাম না। দোষ-ফুরানো কাজটুকুমাত্র সাংগ ক'রে নিজে এসে পড়তে বসতাম। সুতরাং কল্যাণের আর পড়া হ'ত না। কিন্তু কল্যাণ লেখাপড়ায় উন্নতি করুক এটা আমি মনে প্রাণে চাইতাম। এ আত্মব্যবধানেরই বা কারণ কি?

আশ্রমে ফিরে সবচেয়ে পুলকিত হলাম এই শুনে যে আজ আর আমাদের রান্না করে খেতে হবে না, হেডমাষ্টারের বাসায়

আমাদের খাবার নেমন্তন্ন হয়েছে। এ উপলক্ষে হেডমাষ্টারবাবুর সুশিক্ষিতা ও সুরূপা কন্যাদের সংগে আরেকবার আলাপ করার সুযোগ পাব ভেবে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম সেখানে যাবার জন্য।

সন্ধ্যার একটু আগে গা ধুতে নির্জন বনপথটা দিয়ে চলেছিলাম পুকুরের দিকে। হঠাৎ চমকে গেলাম নিতাইকে দেখে। বদছেলে ব'লে আশ্রমের চতুষ্পার্শ্বে যাওয়া তার নিষিদ্ধ, তাই আমার সংগে দেখা করার জন্য সে দাঁড়িয়ে আছে জংগলের আড়ালে। সেই কবে তার বই ফেলে দেওয়া হয়েছিল তারপর এই প্রথম নিতাইর সংগে দেখা। ফুর্তিতে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে।

নিতাই বলল, তুই ন্যাশনেল স্কুল ছেড়ে দিয়ে হাইস্কুলে চলে যা, সমীর, নইলে বি-এ, এম-এ, পাশ করতে পারবি নে, বড়মানুষও হতে পারবি নে। এমন একটা পাপের কথা শোনামাত্র রাগে ঘেন্নায় গা-টা আমার কেমন করে উঠল। তবু শান্তভাবেই বললাম, আমি দেশের কাজ করব। সে বলল, বি-এ, এম-এ, পাশ করলে দেশের বড় কাজ করতে পারবি। আমি বললাম, তুমি আমাকে অমানুষ হতে বল, নিতাই? সে বলল, বড় বড় নেতারা তো তাহলে সবাই অমানুষ। আমি বললাম, তারা তো স্বাধীনতা সংগ্রামে নামার আগেই পাশ ক'রে ফেলেছিল। সে বলল, কেন, আমাদের দেশে বি-এ, এম-এ, পাশ ছাড়াও তো কত জ্ঞানী গুণী কর্মী আছেন, তারা তো কেউ পারেন নি নেতা হতে। আমি বললাম, আমাদের দেশের লোক অশিক্ষিত তাই। সে বলল, আর শিক্ষিত নেতারা যে পাশ-করা লোক ছাড়া কোনো বড় পদ বা নিজেদের মেয়ের বিয়ে দেন না।

আমি বললাম, তোমার মতো চিন্তা সবাই করলে আমাদের দেশ কোনোদিনই স্বাধীন হবে না। সে বলল, কাজের মধ্যে তো গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিস্, ও দোকান আমি একাই বন্ধ করে দিতে পারি। ক্রোধে অপমানে কাঁপতে কাঁপতে আমি বললাম, তুমি আর কোনোদিন আমার এখানে এসো না। অপ্রস্তুত হয়ে বিষণ্ণ মুখে চলে গেল নিতাই।

যথাসময়ের আগেই আমি কল্যাণকে নিয়ে হেডমাষ্টারবাবুর বাসায় গেলাম। বিনতা ও তার মা এসে আমাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা করলেন। সুগতাদেবীও এসে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। আমাদের জীবনটা যেন ধন্য হয়ে গেল। বিশেষ ক'রে আমার চেয়েও বয়সে ছোট বিনতা যখন মার্ক্স এংগেল্‌স্ লেনিন সম্বন্ধে কথা বলতে আরম্ভ করল তখন আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠল বড়দার চিঠিখানা—শান্ত, গণমানসের নবীন জাগরণের যুগে মুক্তির মহাতুফানে উদ্বেলিত আজ বিশ্বের যত অবনত মানবসন্তান। রুশদেশের সাম্যবাদী গণবিপ্লব ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গৌরবময় সাফল্য মুক্তিপাগল করেছে বিশ্ববাসীকে। সে মুক্তিরই রোমাঞ্চময় মন্ত্রগুঞ্জরণে প্রমত্ত হয়ে তুমিও ধাবিত হও ভারতমুক্তির পানে।

বোধহয় জায়গার অভাবে দুই জায়গায় খাওয়ার আসন পাতা হ'ল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে থেকে দু'চারজন হেডমাষ্টারবাবুর ছেলেদের সংগে ঘরে বসল, বাকী সবাই বাইরে বারান্দায় বসলাম। বিনতার-মা তাঁর পরনের ভাল কাপড়খানা ছেড়ে একখানা ভিজা কাপড় পরে আমাদের পরিবেশন করতে লাগলেন। খুব তাড়াতাড়ি

যেন হাভাতের মতো খাওয়া শেষ ক'রে আমি সবার আগে উঠে ঘাটে চলে গেলাম আঁচাতে। ফিরে এসে দেখি যারা ঘরে খেতে বসেছিল তারা আঁচাতে চলছে, কিন্তু যারা বারান্দায় বসেছিল তারা তাদের এঁটো বাসন তুলছে। এতক্ষণে বুঝলাম অব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণের বাড়ী খেতে আসার জন্য এই ব্যবস্থা। তাড়াতাড়ি আমার থালাটা তুলতে গিয়ে দেখলাম কল্যাণ সেটা তার থালার সংগে তুলে নিয়েছে। লজ্জিত হয়ে হাত বাড়ালাম সেটা নিতে। কিন্তু কল্যাণ এমনভাবে চোখ দিয়ে তাড়া ক'রে উঠল যেন এসব ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি আনুষ্ঠানিক ভদ্রতা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাওয়াটাই অন্যায় হয়ে গেছে আমার পক্ষে। কল্যাণ তার সমীরদার কাজ করছে তাতে অন্যের কী!

অদ্ভুত ছেলে এই কল্যাণ। পরের সেবা যেন তার ভগবানের-দেওয়া কাজ। তার বুক ভরা আছে প্রেম, নেই কোনো উচ্ছ্বাস। ক্ষমা আছে, নেই অযথা বিনয়। আছে বদান্যতা, নেই আড়ম্বর। কৈশোরের যে-বয়সটাতে প্রত্যেক মানুষ চায় সর্বস্ব দিয়ে চরম বিপদকে বরণ ক'রেও আপন ছবিটি সমাজমানসে ফুটিয়ে তুলতে, আপন বৈশিষ্ট্যের রংগে সমগ্র ধরণীকে রাংগিয়ে দিতে, আমার ও কল্যাণের এখন সে বয়স। কিন্তু আমার উচ্ছিষ্ট বাসন ধুয়ে কল্যাণ নিজেকে বিলুপ্ত ক'রে দিল তার সমীরদার কাছে। কল্যাণ অভীষ্ট সংসাধনের মধ্যেই খুঁজে পেত পরম পরিতৃপ্তি, কিন্তু আমি তারওপরও চাইতাম একটু যশ।

দশ

গভর্ণমেণ্ট স্থির করেছে এবছর দেশের লোককে জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করতে দেবে না। নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়েছে, এবং তা অমান্য করলে ভীষণ অত্যাচার করা হবে এমন আভাসও দেওয়া হয়েছে। এসব দেখে শুনে অনর্থক প্রাণহানির আশংকায় জাতীয়-নেতারা সমস্ত কর্মীদের আদেশ করেছেন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন থেকে বিরত থাকতে। কিন্তু দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমারও যেন ততই ইংরেজের কাছে লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল।

তার মধ্যে আরেক বিভ্রাট উপস্থিত হ'ল। গত দুবছরের মধ্যে এমন একটা দিন যায় নি যেদিন সামন্তপুর শিবিরের বীরত্বকাহিনী সারাভারতময় সংবাদপত্রে প্রচারিত হয় নি। প্রতিদিন আমাদের ভলাণ্টিয়াররা পিকেটিং করতে যেত ব'লে দেশবাসী প্রতিদিন পথ চেয়ে থাকত তাদের অপূর্ব কীর্ত্তিগাঁথা পড়বার জন্য। কিন্তু আজ অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেল সব। দোকানী নিজ থেকেই গাঁজার দোকান বন্ধ করে দিয়েছে, ক্রেতারাও আর যায় না সেদিকে। একটা অদ্ভুত বিপর্যয় দেখা দিল আন্দোলনের কর্মধারায়।

নিতাই নামে একটা বদমায়েস ছেলে নাকি সর্বত্র প্রচার

করেছে—ময়নাগঞ্জের ফকিরসাহেব স্বপ্নে আদেশ পেয়েছেন পুলিশ এক সন্ন্যাসিনীকে গোপনে গাঁজার দোকানে হত্যা করেছে, দোকান বন্ধ ক'রে না দিলে দোকানী নির্ব্বংশ হবে, ক্রেতাদেরও অমংগল হবে। দোকানী তবু দোকান খুলেছিল, বিকালে বাড়ী ফিরে দেখে তার ছেলেটিকে সাপে কেটেছে। পুলিশ এসে নিতাইকে প্রহার করল, সবাইকে বলল নিতাইর কথা মিথ্যে। তবু লোকের মন থেকে ভয় ঘুচল না, দোকানও আর খুলল না।

সত্য-অহিংসার পূজারী নেতারা মিথ্যা দ্বারা কার্য হাসিল করতে নারাজ, তিরস্কার করলেন নিতাইকে। গ্রামের লোকও করল খুব উৎপীড়ন। এমনসময় আমার মা তাকে রক্ষা করলেন আশ্রয় দিয়ে। শুনে নেতারা মাকে নিন্দা করতে লাগলেন। কল্যাণের মনটাও বিরূপ হয়ে গেল মায়ের প্রতি। আমার লজ্জা করতে লাগল।

স্থির করলাম সামন্তপুরের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হলে নেতাদের নিষেধ সত্ত্বেও জাতীয়দিবস উদ্‌যাপন করতে হবে। বাইরে করলে পুলিশের ভয়ে লোক আসবে না। ন্যাশনেল স্কুলে বা আশ্রমেও করতে দেবেন না নেতারা। কোথায় করা যায়?

খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে ভাবছি এসব কথা এমনসময় খুব হাসির রোল শোনা গেল বাইরে। বুঝলাম অধীর এসেছে কল্যাণের কাছে। অনেকদিন পরে গুরু-শিষ্যের মিলন ঘটেছে তাই কথার চেয়ে কলহাস্য বেশী। আমি কাছে যেতেই অধীর বলল, মেজদা, তোমাকে মা বাড়ী যেতে বলেছেন আজ।

কাজকর্ম সেরে একটু বেলা হলে কল্যাণকে নিয়ে বাড়ী রওনা হলাম। ডাকঘরের পথটা দিয়ে চললাম চিঠি দেখার জন্য। পথের

বাঁকের বাগানটা থেকে আনন্দঠাকুরাণী বললেন, তোমরা কি ডাকঘরে যাবে? বললাম, হাঁ, যাব। তিনি আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বললেন, চিঠিটা বাক্সে ফেলে দিও। পোস্‌মাষ্টারকে বলো খুব জরুরী চিঠি, আমার জামাইকে লিখেছি, যেন টেলিগ্রাম মনে ক'রে পাঠিয়ে দেয়।

ডাকঘরের কাছে এসে লক্ষ্য করলাম আনন্দঠাকুরাণী তাঁর নিজের পথে না গিয়ে জংগলের আড়াল দিয়ে আমাদেরই পেছনে আসছেন। কল্যাণকে বললাম, আমাদের কাছে চিঠিটা দিয়ে বুড়ির মনে শান্তি নেই, দেখতে এসেছে আমরা তার চিঠিটা বাক্সে ফেলি কিনা। কল্যাণ তো রেগে মেগে আগুন, বলল, তুমি কেবল মানুষের খারাপ দিকটাই দেখ, সমীরদা, ওঁর হয়তো এদিকে কোনো কাজের কথা মনে পড়েছে।

চিঠিটা বাক্সে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে আসছি এমনসময় ওপাশের দরজাটা দিয়ে আনন্দঠাকুরাণী ঘরে ঢুকে পোষ্টমাষ্টারকে জিগগেস করলেন, দুতিনটি ছেলে এসে একখানা চিঠি দিয়ে গেছে? পোষ্টমাষ্টার বললেন, আমি তো দেখি নি। তারপর তিনি পিয়নদের কাছে গিয়ে জিগগেস করলেন, তারাও বলল, দেখি নি তো, মা। আমি কল্যাণকে বললাম, বিশ্বাসভংগের ঘা খেতে খেতে মানুষ আর কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। উৎফুল্ল হয়ে কল্যাণ বলল, এমন দিন কবে আসবে, সমীরদা, যখন কেউ আর অবিশ্বাস করবে না কাউকে?

আমাদের বাড়ীতে ঢুকতেই যা চোখে পড়ল তা কল্পনা করাও পাগলামি। আমাদের খাবার ঘরে আমার মামাতোভাইরা খেতে

বসেছে, মামাবাড়ীর চাকর রোস্তমও বসেছে তাদের সংগে একই সারিতে, আর মা কাছে বসে পরিবেশন করছেন সবাইকে। রোস্তম শুধু মুসলমানই নয়, আমার মামাবাড়ীর প্রজা ও চাকর। খাওয়া বিষয়ে মা ছিলেন অতিমাত্রায় সংযত ও সাত্ত্বিক। জমিদারবাড়ীর মেয়ে হয়ে এই বিধর্মী প্রজা চাকরটাকে তার মনিবপুত্রদের সংগে খাবারঘরে বসিয়ে খেতে দিলেন কিকরে? উদারতা থাকা ভাল, তাব'লে এতটা বাড়াবাড়ি কি ভাল? ছোটলোকেরা কি মাথায় উঠে যাবে না এতে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন পল্লীগ্রামে পিসীমার মতো গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতে এত সাহস?

খাওয়া হয়ে গেলে চিরাচরিত প্রথানুযায়ী রোস্তম তার সকড়ি থালাটা তুলে নিল। দেখা মাত্র মা সেটা কেড়ে নিয়ে বললেন, পিসীমার বাড়ী মানুষ বেড়াতে আসে কি সকড়ি বাসন ধুয়ে দিতে নাকি রে? ছলছল করুণ আনত চোখদুটি মায়ের পায়ের উপর নিবদ্ধ রেখে রোস্তম নীরবে দাঁড়িয়ে রইল, যেন বলতে চাইল, মা, তুমি এত বড়, এত ভালবাস তুমি আমাদের? মন্ত্রমুগ্ধের মতো কল্যাণ আপনমনেই আবৃত্তি করতে লাগল—

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্র রোষে
দুর্ভিক্ষের দ্বারে ব'সে
ভাগ ক'রে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥

অকস্মাৎ কল্যাণ সচরাচর যা করে না তাই করল। দ্রুত গিয়ে

একটা প্রণাম করল মাকে, আমাকেও একটা। আমার মন শুধু ব'লে উঠল, আমার মাও মা, বিনতার মাও মা!

পরদিন বেলা প্রায় এগারটার সময় মা নিতাইদের পুকুর থেকে জল এনে কলসীটা রেখে দিয়ে বিষণ্ণমুখে ব'সে রইলেন। পরে উঠে গিয়ে বাক্স খুলে চলে গেলেন ধনী জ্ঞাতির স্ত্রীর কাছে তাঁর বিয়ের আংটিটা নিয়ে, শত দুঃখেও যাকে করেন নি হাতছাড়া।

নিতাই বারটার সময় কলকাতা রওনা হয়ে যাবে। তার মামীমা তার জন্য দুটি ভাতও রান্না ক'রে দিতে পারেন নি। ভাড়ার অতিরিক্ত একটি পয়সা দেন নি যে পথে কিছু কিনে খাবে। দুদিন পথে কাটিয়ে সেই দুর্দেশে গিয়ে কোথায় কার কাছে উঠবে, তারও কিছুই ঠিক হয় নি। কবে কাপড়ের দোকানে কাজ ক'রে মাইনে পাবে ভরসা তাই।

যথাসময়ে নিতাই এল মাকে প্রণাম করতে। নিতাইকে কোনোদিনই কেউ ভালবাসত না। আজ তাকে সবাই ঘৃণা করে। মিথ্যা গুজব রটিয়ে স্বদেশী কাজ বন্ধ করাতে গ্রামবাসীরা তার উপর ক্রুদ্ধ, গাঁজার দোকান বন্ধ হওয়াতে গভর্ণমেণ্ট ক্রুদ্ধ। সবার দরজা তার কাছে বন্ধ। সসংকোচে অপরাধীর মতো সে আমাদের ঘরে প্রবেশ করল। আমাদের একজনের ভাত খাইয়ে, হাতে পাঁচটা টাকা গুঁজে মা চোখের জলে বিদায় দিলেন তাকে।

প্রখর রৌদ্রের মধ্যে একাএকা বিছানার বোচকাটা মাথায় নিয়ে নিতাই চলল তার চিরপ্রিয় সামন্তপুর ছেড়ে। যে মামাবাড়ীর জন্য সে জীবনপাত করেছে, যে সামন্তপুরের রোগে

শোকে সে কত ক্লেশ স্বীকার করেছে সেখানটার মধ্যে আজ এমন কেউ নেই যে এই অকৃত্রিম বন্ধুর বিদায়ের ক্ষণে একবিন্দু অশ্রু মোচন ক'রে বলে, নিতাই, কলকাতা পৌঁছে কিন্তু একটা চিঠি দিয়ো ভাই। টম্ শুধু চলেছে তার পেছনে। আর থাকতে না পেরে আমিও ছুটে গিয়ে সংগ নিলাম তার।

নিতাই বলল, তুই ন্যাশনেলস্কুল ছেড়ে হাইস্কুলে চলে আয়।

বিরক্ত হয়ে আমি বললাম, তোমার সেই এক কথা, দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে কে আমরা হাইস্কুলে চলে গেলে ?

নিতাই বলল, স্বাধীনতা ফাধীনতা কিছুই নয়, যারা চেষ্টা ক'রেও বড়লোক হতে পারে নি তারাই গভর্ণমেণ্টের চোখে বড় হওয়ার জন্য দেশের লোকজনকে ক্ষেপিয়ে হইহল্লা করে। গভর্ণমেণ্ট 'আয় তু' ব'লে ডাকলেই হ্যাংলা কুকুরের মতো ছুটে গিয়ে পা চাটবে তার। মাঝখান থেকে কতগুলি ভাল গরীবের ছেলের সর্বনাশ হবে। তোদের মতো ভাল ছেলে যদি সরকারী চাকরিতে না ঢোকে তাহলে যারা এতকাল বড় চাকরি ক'রে এসেছে তারাই করবে, গরীবদের থেকে আর কেউ পাবে না। খবরের কাগজে দেখতে পাস্নে বড়লোক নেতারা নিজেদের ছেলেমেয়েকে লেখাপড়ার জন্য বিলাত পাঠিয়ে গরীবদের বলে 'ইংরেজী শিক্ষা খারাপ, গোলামখানায় যেয়ো না'।

চুপ করে রইলাম। রোদের দিকে চেয়ে নিতাই বলল, ফিরে যা সমীর, তোকে একাএকা ফিরতে হবে রোদের মধ্যে।

ফিরে এলে মা বললেন, আশ্রমে ফিরে যা আজই। আমি বললাম, কাল জাতীয় দিবস ক'রে যাব। মা রাজী হলেন।

পরদিন ভোরে সমবেত জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিলাম। জাতীয়পতাকার বাঁশটা ধ'রে আমি শপথ আবৃত্তি করলাম, আমার সংগে সংগে সমবেত জনতা বললে—ভারতবাসীর দারিদ্র্য মোচন করিতে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম। ভারতবাসীর সম্মান পুনরুদ্ধার করিতে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম। ভারতবর্ষ থেকে বিদেশী প্রভুত্ব বিতাড়িত করিতে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম।

হুড়্ হুড়্ ক'রে আমাদের বাড়ীর মধ্যে এসে ঢুকল বহু সশস্ত্র সৈন্য, সংগে স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট বিভুসেন। আমি প্রাণপণে আঁকড়িয়ে ধরলাম জাতীয়পতাকার বাঁশটা। শুরু হয়ে গেল মার-ধর প্রলয় তাণ্ডব। সৈন্যরা বন্দুকের বাট দিয়ে আমাকে পিটতে লাগল, সংগিন দিয়ে খোঁচাতে লাগল। সব সহ্য ক'রে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু হাত পা অবশ হয়ে আসতে লাগল। মনে হ'ল মান-সম্মান আশা-ভরসা সব পতাকার সংগেই চ'লে যাবে এখনি। হঠাৎ বিভুসেন আমার পেটের মধ্যে একটা লাথি মারল। পড়ে যাওয়ার আগে আমি সমস্ত প্রাণ উজাড় ক'রে এক চীৎকার দিলাম, বন্দেমাতরম্।

কোথা থেকে মা ছুটে এসে ধরলেন পতাকাটা। ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম করলেন মাকে মারতে। কিন্তু সৈন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। বলল, কমজোর জেনানালোগকো মারতে পারব না সাব। অগত্যা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেই চাবুক দিয়ে মাকে এক ঘা মেরে বললেন, ছেড়ে দে হারামজাদী। কথাটা কানে যাওয়া মাত্র

কিসের একটা ধাক্কা খেয়ে যেন আমি লাফিয়ে উঠে ম্যাজিষ্ট্রেটের টুটিটা চেপে ধরলাম। তাঁর পকেট থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে জংগলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তাঁকে ফেলে দিলাম মাটিতে।

আমার জ্ঞান ফিরে এল জেল হাসপাতালে। নির্দিষ্ট তারিখে কোর্টে আমার মোকদ্দমা উঠল। বিচারক মিঃ পেডি, আমাদের মহকুমার ভূতপূর্ব শাসক। এক দৃষ্টে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। জেরার উত্তরে আমি বললাম—আমার নাম সমীর কুমার রায়, বাবার নাম স্বর্গীয় চিরঞ্জীব কুমার রায়, আমার জন্ম হয়েছে ১৯১০ সনের ২রা নভেম্বর। দেশকে স্বাধীন করা প্রত্যেক মানুষের পবিত্র কর্তব্য। আমি ঠিক কাজই করেছি।

হঠাৎ কোর্ট স্থগিত করা হ'ল। পুলিশরা কোথায় যেন টেনে নিয়ে গেল আমাকে। বুঝলাম স্বীকারোক্তির জন্য যন্ত্রণা দেবে। কিন্তু এলাম আমি মিঃ পেডির কামরায়। শুধু আমি আর তিনি। পেডি বললেন, তোমার মতো মেধাবী ছেলে বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া ক'রে এলে কত বড়লোক হ'তে পারে। তুমি যেতে রাজী হলে আমি তার ব্যবস্থা করব। যাবে?

—না

—তোমার মা ভাই বোন সবার দুর্দশা তুমি ঘোচাতে পারবে।

—আমি যাব না।

আবার কোর্ট বসল। বিচারে আমার তিনবছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

এপার

জেলখানায় কয়েকজন নেতৃস্থানীয় প্রথমশ্রেণীর রাজবন্দী ছিলেন। আমি ছিলাম সশ্রম-কারাদণ্ডিত তৃতীয় শ্রেণীর রাজবন্দী।

নেতারা প্রথমশ্রেণীভুক্ত হলেও তৃতীয়শ্রেণীর রাজবন্দীদের সংগে খুব সহজভাবে মেলামেশা করতেন। বাদে অধ্যাপক প্রবোধ চক্রবর্তী। অতিশয় সুপণ্ডিত হলেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না মোটেই। বিশেষ সতর্ক থাকতেন আপন প্রথমশ্রেণীত্বটা লোককে জানিয়ে দিতে। সর্বদাই গর্ব করতেন বড় সরকারী কর্মচারী বন্ধু আছে ব'লে। আর ভাবটা দেখাতেন ইংরেজী ছাড়া অন্যকোনো ভাষায় কথা বলতেই জানেন না।

অন্যান্য তৃতীয়শ্রেণীর বন্দীর ন্যায় আমিও সাহস করতাম না প্রবোধবাবুর কাছে ঘেঁষতে। অকস্মাৎ এক অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটল তাঁর মধ্যে। কিক'রে তিনি জানতে পারলেন আমার বড়ভাই হচ্ছেন তাঁরই গুরুদেব বিখ্যাত বিপ্লবী সন্দীপ কুমার রায়, বর্তমানে পলাতক ফাঁসীর আসামী। অন্য শিক্ষকদের সংগে প্রাণপণ যত্ন সহকারে তিনিও পড়াতে লাগলেন আমাকে।

সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, গণিত, রসায়ন,

পদার্থ, প্রাণতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব কতকিছু যে পড়লাম তার ঠিক নেই। লেখাপড়া আমার স্বভাবগত, কিন্তু এমন লেখাপড়ার সুযোগ আর ইতিপূর্বে পাইনি কখনও। অজ্ঞাত বিপদের ন্যায় অনধীত বিষয় সম্বন্ধেও মানুষ পোষণ করে একটা অনুচিত বিভীষিকা। প্রবোধদা আমাকে মুক্ত ক'রে দিলেন সে বিভীষিকা থেকে। কারাগারের দুর্বিষহ ক্লেশ সত্ত্বেও তিনটা বছর যেন কেটে গেল চোখের নিমেষে।

মুক্তির দিন সকালে আনন্দের চেয়ে আমার মনে ভয়ই হল বেশী। খালাস পেয়ে যাব কোথায়, খাব কী? মা পিসীমা ভাইবোনরা কি এখনও বেঁচে আছে? কোথায় আছে তারা?

সাধারণ নিয়মানুযায়ী খালাসপ্রাপ্তকে কিছু পয়সা দেওয়া হয় পথখরচ বাবদ। কি জানি কেন তাও দেওয়া হ'ল না আমাকে। কারাগারের সিংহদরজা পার হয়ে আমি যেন অথই জলে পড়লাম। বিপুল শহর, অগণিত বাসীন্দা, আমি একেবারে একা। বাড়ী যাব কিক'রে? অনাহারে কতদূর হাটতে পারব?

আমার পরিচিত সাম্যবাদী নেতারা প্রায় সবাই ছিলেন জড়বাদী। অনেকসময় আমার সাধারণ ব্যবহার দেখে তাঁরা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে বলতেন, আমাদের সাম্যবাদ আর নাস্তিকতা পুঁথিলব্ধ কিন্তু তোমারটা একেবারে সহজাত। চরম নাস্তিকতা সত্ত্বেও নিদারুণ সংকটকালে কিন্তু নিঃসহায় আত্মা আমার খুঁজে ফিরত কোন্ এক অজানা বন্ধুকে। বলত, ঠাকুর রক্ষে কর। আজও আমার মন কেবলি বলতে লাগল, ঠাকুর রক্ষে কর।

অন্তরস্থিত ব্যথার গান আমার কখন যেন আপনাকে মিলিয়ে

দিয়েছিল বাহিরের এক করুণ তানে। বন্যাপীড়িতদের ত্রাণার্থে চাঁদা তুলছিল ছেলেদের একটি শোভাযাত্রা। সমবেত কণ্ঠে গাইছিল—সন্তান তোমার কাঁদে অন্নহারা, ভিক্ষা দাও গো জননী…। দুটি ছেলে তাদের পুরোভাগে একটি কাপড়কে থলের মতো ক'রে ধরে রেখেছিল, তার উপর পড়ছিল যত চাল ডাল, কাপড়-চোপর, টাকা-পয়সা।

মানুষ দেখে যে মানুষের এত আনন্দ হয় আগে তা জানতাম না। শোভাযাত্রাটা আমার কাছে আসতেই থলেধারীদের মধ্যে একজন ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। আমি ডাকলে ভগবান না শুনে পারেন না। নিতাই এক নিঃশ্বাসে কত প্রশ্ন যে জিগগেস করল আমাকে—আমার মা'র কথা, পিসীমার কথা, ভাইবোনদের কথা, টমের কথা, হিজলগাছটার কথা, সামন্তপুরের আরও কত কথা।

এত আনন্দ কিন্তু তার নিভে গেল আমার বর্তমান অবস্থার কথা শুনে। সানুনয়ে বলল, রতনপুর স্কুলের হেডমাষ্টার নাকি জেল-ফেরত ছাত্রদের ভর্তি করেন, তুই সেখানে গিয়ে টেষ্ট দে। এবারই তোকে ম্যাট্রিক দিতে হবে।

—তোমার কাপড়ের দোকানটা কোথায়, নিতাই ?

—মিথ্যে সাক্ষি দিতে রাজী হইনি ব'লে মালিক চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছে।

—তাহলে এখন কি কর তুমি ?

—কেন, এই যে ! সবাইকে দিয়ে থুয়ে মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকা আসে।

—তার মানে ?

—দুর্ভিক্ষ মহামারী বন্যা সবই মিথ্যে। রোজ সংকট-নিবারণী-সমিতিকে দিতে হয় দু'টাকা, অন্যান্যকে দিতে হয় চার আনা ক'রে, বাকীটা আমার আর ওই থলেধারী বন্ধুটির। শহরে, তীর্থস্থানে, মেলায় ঘু'রে ঘু'রে আমাদের দিন কাটে।

—চুরি কর !

—হাতে তিরিশটা টাকা জমলেই এসব ছেড়ে দিয়ে নিজেই একটা কাপড়ের দোকান করব কলকাতাতে।

—যদি তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেয় ?

—সুবিধে হবে না। সংকট-নিবারণী-সমিতি যে গভর্ণমেণ্টের কাছে রেজিষ্টার করা আছে। পুলিশকেও আমরা টাকা দিই ঠিকমতো।

—জোচ্চুরি করতে লজ্জা করে না ?

—করতে আবার লজ্জা কি, যাকিছু লজ্জা তো বলতে। আমি বলব কেন অন্যকে ? আর করতেও কি সহজে রাজী হয়েছি। না খেয়ে না খেয়ে হয়রাণ হয়ে গিয়েছিলাম একেবারে। চাকরি দেবার মালিকরা তো সৎলোক চায় না, চায় এমন লোক যে তাদের কাছে থাকবে সৎ কিন্তু অন্যের কাছে হবে অসৎ।

একটা নূতন জগতে যেন এসে পড়েছি। এরকম দুষ্কার্যও আছে সংসারে ! ঘৃণায় সর্বাংগ আমার জ্বলে যেতে লাগল। বললাম, আমি যাই। নিতাই আমার হাতটা ধরে বলল, তোর খিদে পেয়েছে, চল খাবি কিছু। আমি বললাম, তোমারটা খেলে পাপ হয়। নিতাই হেসে বলল, পাপ ! আমার মনিব, এবার

স্বদেশীওলাদের পক্ষ থেকে এসেমব্লীর মেম্বার হয়েছে শুধুমাত্র টাকার জোরে। টাকা বিভুসেন কিভাবে রোজগার করে জানিস্? ব্যাংক ফেল করিয়ে সহস্র সহস্র অনাথা বিধবার টাকা মেরে, ভদ্রলোকের ছেলেদের মেয়েমানুষ দিয়ে ভুলিয়ে এনে জুয়া খেলিয়ে।

—ইতরের মতো অন্যের দোষ গেয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চাও।

—তোদের মতো ভাল ছেলেরা যতদিন না ভালমানুষি ছেড়ে লেখাপড়া শিখে ক্ষমতা নেবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের মতো ইতরদের কেউ বশ করতে পারবে না। তোদের মতো অন্ধ আমরা নই। আমাদের সংগে দুটি অনাথ ছেলে আছে, তাদের জন্য যে কত ভিক্ষা চেয়েছি কিন্তু কেউ একটা পয়সাও দেয়নি।

—তাহলে এখন দিচ্ছে কেন?

—যশের লোভে, নিন্দের ভয়ে।

—একটা জোচ্চুরের দল গড়েছ, সেটার সাফাই গাইতে নানা রকমের গল্প বলছ। তোমার সংগে দেখলে আমাকেও চোর বলবে লোকে।

—আমার সংগে তোকে থাকতে হবে না। তুই টাকা নিয়ে যা, কোথাও-থেকে কিছু খেয়ে রতনপুর চলে যা।

—তোমার টাকা ছুঁলেও পাপ হয়।

তবু নিতাই জোর ক'রে আমাকে টাকা দিতে এলে আমি হাতটা ছিনিয়ে নিয়ে চলে এলাম। নিতাইর শোভাযাত্রা দূরে

চলে গিয়েছিল, বাধ্য হয়ে তাকে চলে যেতে হ'ল। যাবার আগে তাকে ব'লে দিলাম, তোমার আড্ডা অশিক্ষিত ছোটলোকদের মধ্যে, ভদ্রলোকদের মধ্যে তুমি এসো না।

বেলা বাড়ার সংগে সংগে রোদও বাড়তে লাগল। জেল থেকে বেরোবার আগে কিছু খাইনি, খিদেয় পেট জ্বলতে লাগল। ঠাকুরকে ডেকেছিলাম খাওয়ার পয়সার জন্য, ঠাকুর পয়সার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমার নিজের দোষেই তা নিতে পারলাম না। রাগ হ'ল মায়ের উপর, মনটাকে আমার ভরে রেখেছেন কতগুলি সুনীতির কুসংস্কারে।

অবশেষে এসে পৌছলাম সামন্তপুরে। মহামারীর পরে আত্মীয় পরিজন হারিয়ে মানুষ যেরকম অসহায় উদাস আতংকগ্রস্ত হয়ে তারপর আবার একদিন শুরু করে নূতন জীবন, সামন্তপুরবাসীরাও সেরকম সরকারী অত্যাচার-উৎপীড়নের করাল কালো ছায়াটাকে কাটিয়ে উঠে আবার কোনোমতে চলতে শুরু করেছে নূতন ধারায়। অতীতের উদ্দীপনাময় দিনগুলি যেন তারা ভুলে গেছে একেবারে। কেউ কারও সংগে মেশে না, গুপ্তচরের ভয়ে প্রাণ খুলে কথাও বলে না। স্বাধীনতার নাম শুনলেও হয়ে ওঠে বিভীষিকাগ্রস্ত। আমাকে কেউ চিনতেও যেন পারল না।

শীতের সন্ধ্যায় শূন্য শ্মশানের মতো খা খা করছে আমাদের বাড়ীটা। শুধুমাত্র রান্নাঘরটা দাঁড়িয়ে আছে জীর্ণশীর্ণ অবস্থায়, অংগারগুলি ছাড়া অন্য ঘরগুলির কোনো চিহ্নও নেই। বাবার গায়ের-রক্ত-জল-করা, পিসীমার সর্বস্ব-বিসর্জন-করা বাড়ীটা পুলিশ পুড়িয়ে দিয়েছে বিনাপরাধে। নির্জন নিঝুম অন্ধকারে

বাড়ীতে পা দিতেই কে ছুটে এল আমার কাছে। আমাদের চিরসাথী টম। আমার হাত পা চেটে, গায়ে লাফিয়ে উঠে আদর জানিয়ে একরকম ঠেলতে ঠেলতেই আমাকে নিয়ে গেল রান্নাঘরটায়। অবস্থার চাপে, দারিদ্র্যের পীড়নে মালিকরা চলে গেছে বাড়ী ছেড়ে, কিন্তু পারে নি টম। অসহায় অবস্থায় বিনাপ্রতিদানে ক'বছর ধ'রে মনিবের বাড়ী পাহারা দিয়ে সুখ দুঃখের সমসাথী দুর্ধর্ষ টম আমাদের আজ হয়ে গেছে কংকালসার।

মা পিসীমা ভাইবোনরা আমার কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। একদিন নিশুতি রাতে পুলিশরা এসে তাদের হঠাৎ গ্রাম থেকে বের করে দিয়ে নাকি ঘরগুলি পুড়ে ফেলেছে। আমাকে দেখে প্রতিবেশীরা কথাও বলল না, ভয়ে মরতে লাগল আবার বুঝি পিটুনী পুলিশ আসবে।

আমি কোথায় যাব? কী খাব? দুদিন যাবৎ কিছু খাই নি, কবে খাওয়া জুটবে তাও জানি নে। সংগে একটি পয়সাও নেই যে কোথাও যাব। মোমবাতিটা জ্বেলে, গায়ের চাদরটা মাটিতে বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম ক্লান্ত দেহে।

—একি সমীর, মাটির উপর পড়ে আছ কেন?

—বাবা, তুমি যে মরে গেছ, এখানে এলে কী ক'রে?

—আমাকে তুমি ভয় কচ্ছ, সমীর?

—হ্যাঁ, মরা মানুষ মেরে ফেলে মানুষকে।

—কে বললে আমি মরে গেছি? মানুষের মৃত্যু নেই। সে চলেছে অন্তবিহীন এক পরম সুন্দরের দেশে। অনন্তকাল

ধ'রে শুধু চলবে সোপানের পর সোপান বেয়ে। পৌছবে একদিন চিরসুন্দরের দেশে। কিন্তু ধরা দিয়েই চিরসুন্দর আবার চলে যাবেন অনেক দূরে। আবার মানুষ ছুটবে তাঁর পেছনে। আবার পাবে, আবার হারাবে। জন্ম মৃত্যুর সীমায় নিবদ্ধ এ জীবন তো শুধু চিরসুন্দরকে লাভ করার একটা অনুশীলন ক্ষেত্র। পার্থিব মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে মানুষ চিরসুন্দরের কোলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে স্ব স্ব কর্ম অনুযায়ী লাভ করে চিরসুন্দরকে। আবার তাঁকে হারিয়ে জন্ম গ্রহণ করে পৃথিবীতে। আবার তাঁকে পাবার জন্য প্রচেষ্টা ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুর কোলে।

"আমার মনের নৃত্য কতবার জীবন মৃত্যুরে
লংঘিয়া চলে গেছে চিরসুন্দরের সুরপুরে,
চিরকাল তরে সে কি থেমে যাবে শেষে
কংকালের সীমানায় এসে?
যে আমার সত্য পরিচয়
মাংসে তার পরিমাপ নয়।"

—তুমি কোথায় আছ, বাবা?

—আমি মরি নি, আগের মতই বেঁচে আছি। তোমার জন্য বড় কষ্ট হয়।

—খুকু কেমন আছে?

—ভাল আছে।

—আমি তোমার সংগে যাব, বাবা। তুমি চলে যাওয়াতে আমাদের বড় কষ্ট। আমরা না খেয়ে থাকি। বড়লোকরা আমাদের যন্ত্রণা দেয়।

—না, আমার সংগে যেতে নেই। তুমি এখানে থেকে তোমার মা পিসীমা ভাই বোন সবার দুঃখ ঘুচাও। তোমার বড়দার মতো বড়মানুষ হও।

হঠাৎ ঘুম ভেংগে গেল কার কণ্ঠস্বরে—আজ এই বাড়ীর কুত্তাটার সাড়া নাই কেন? ঘরের মধ্যে আলো দেখা যায় কেন? আয় টম্, টম্। একজন স্ত্রীলোক এসে ঘরে প্রবেশ করল। অন্ধকারের মধ্যেও গ্রামের গেজেট অপয়া আনন্দঠাকুরাণীকে চিনতে পেরে উপবাসী আমার মনটা বিরক্তিতে একেবারে ভরে গেল।

আমাকে দেখে আনন্দঠাকুরাণী বিস্মিত হয়ে গেলেন। কাগজে মোড়ানো বাটিটা মাটিতে রেখে যথাসম্ভব শুচিতা রক্ষা ক'রে কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, সমীর, কখন এলি বাবা! এত মিষ্টি কথা আর কখনও শুনি নি তাঁর মুখে। বললাম, এখনি এয়েছি, আপনি তীর্থ থেকে কবে ফিরলেন, পিসীমা?

—হায় রে আমার তীর্থ! কাশীতে যে কেন মানুষ তীর্থ করতে যায়! যত সব অসৎ মাগীদের আড্ডা। প্রথম দিন খোয়া গেল আমার শাদার কৌটাটা। দুদিন না যেতেই চুরি গেল আমার গামছাটা। পোড়ারমুখীদের বছর ঘুরবে না, সর্বনাশ হবে, সর্বনাশ হবে। আমার ধম্মের জিনিস গা ফুটে বেরোবে, পারার মতো গা ফুটে বেরোবে।

আমার খুব ভয় হ'ল। মা বলতেন আমার পিসীমা ও আনন্দঠাকুরাণী খুব সতী, সতীর কথা নিষ্ফল হয় না। তখন 'সতী' কথাটার অর্থ না বুঝলেও এটা দেখতাম লোকে তাঁদের

অভিশাপকে ভয় করে খুব। বৃদ্ধার অবস্থা ভেবেও কষ্ট হ'ল। একটা জিনিস খোয়া গেলে তাঁর পক্ষে আবার পাওয়া অসম্ভব। দিনের পরদিন কষ্টে কাটাতে হবে ওটির অভাবে। বিপুল সংসারে এমন কেউ নেই শত দুঃখেও একবার তাঁকে বলবে, কেমন আছ? বৃদ্ধা বললেন, তোরা আমার বাপের বংশের ছেলে, তোরা বেঁচে থাকলে গ্রামই আমার তীর্থ। এত দিন তুই কোথায় ছিলি, বাবা?

—সেদিন মাত্র জেল থেকে বেরোলাম।

—জেল!

—আজই সন্ধ্যার একটু আগে পৌছিয়েছি গ্রামে।

বৃদ্ধার চোখদুটি ছল্‌ছল্‌ ক'রে উঠল। অভাবনীয় করুণাস্নিগ্ধ রূপ! তীর্থভ্রমণেরই ফল? তিনি গেলে বাটিটা দেখলাম। খানিকটা তরকারি-মাখা আতপচালের ভাত। দরিদ্র বিধবা আপন কষ্টার্জিত অপ্রচুর অন্নের অংশ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন টমকে!

একটু পরে তিনি আবার এলেন। সংগে একটা বালিশ, একটা ছেঁড়া মাদুর, এক ঘটি জল, একটা বাটির মধ্যে কিছু মুড়ি। আমার সমুখে রেখে বললেন, খেয়ে নে, অনেক রাত হয়ে গেছে। খেতে ব'সে বললাম, সেবকসদনের সব কোথায় গেছে, পিসীমা?

—পুলিশে কিছু রেখেছে না কি তার। সবাই চলে গেছে চাকরি বাকরি করতে। বৌ-পালানোর অপমানে কে চলে গেছে উদাসী হয়ে। কল্যাণ শুধু পড়ে আছে গ্রামে। নিতাই দু'এক টাকা পাঠায়।

—কোন্‌ নিতাই?

—এবার তুই এসব ছেড়ে দিয়ে বি-এ এম-এ পাশ কর্।

—পাশ করা হবে না। বিদ্যে থাকলে উপাধির কি দরকার?

—উপাধি না থাকলে কোনো কাজেই আসে না বিদ্যে। আমাদের কর্তা ছাত্রবৃত্তি পাশ করেছিলেন ব'লেই না হুলস্থুল পড়ে গিয়েছিল সারা দেশে। সন্দীপ বলত আগে বিলাতি উপাধি পাশ কর, খ্যাতিমান হও, জজ ব্যারিষ্টার হয়ে পসার কর, তারপর সব ছেড়ে দিয়ে লেগে যাও দেশের কাজে, তবেই না দেশের লোক মানবে তোমায় নেতা ব'লে।

—যে শিক্ষার নিন্দা করি, তা কি গ্রহণ করা উচিত?

—তুই ছেলেমানুষ। সন্দীপ বলত মানুষের মন বড় অদ্ভুত। বিপ্লবীরাও অবিপ্লবীরই মতো। চলতি শিক্ষাটাকে নষ্ট করবে, আবার তারই ছাপ না থাকলে কাউকে গ্রাহ্য করবে না বিদ্বান ব'লে। রোজগারের চলতি পথটাকে চায় নষ্ট করতে, আবার সে পথের লোক ছাড়া অন্য কাউকে স্বীকার করে না বড়মানুষ ব'লে। সাম্যবাদী নেতা হতেও আগে চাই সাম্রাজ্যবাদী উপাধি আর পুঁজিবাদী স্বত্বাধিকার। ফলে গণযুদ্ধ বারে বারে হয় বিপথে চালিত। দাসত্বের এমনি নিদারুণ অভিশাপ।

বড়দার প্রভাবে প'ড়ে এই গ্রাম্য স্ত্রীলোকটিও ভাবেন দেশের কথা। আমি বললাম, পড়ব যে, টাকা পাব কোথায়? রতনপুর স্কুলের হেডমাষ্টার দয়া ক'রে বলেছেন চার দিনের মধ্যে ফীসের ত্রিশটাকা জমা দিলে আমায় এবছরই পাঠাতে পারেন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে। ভগবান যোগাবেন, ব'লে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

খাওয়ার শেষে মাখা ভাতটা নিয়ে ডাকলাম, টম্ টম্। বারান্দায় শুয়েছিল সে। সাড়া না পেয়ে কাছে গিয়ে ধাক্কা দিলাম। যাকে ডাকছি সে আর নেই এই নশ্বর দেহটার মধ্যে। আপন কর্তব্য পালন ক'রে মনিবকে তার দায়িত্ব ফিরিয়ে দিয়ে চলে গেছে চিরতরে। অশ্রুর আভাস চিকচিক করছে অনাহারক্লিষ্ট মুখখানির উপর।

মন্দ ভালর পরপারে, অতীতের চির অন্ধকারে,
চলে গেছে সে, তবু মরণে হয়নি জীবনের শেষ।
ভালবেসে দিয়ে গেল যে, সর্বস্ব ধন আপন জীবন,
চাইল না কোনো প্রতিদান, পেল না কোনো পরিচয় মান
হারাবার তবু সে নয়, প্রেম সে মানে না পরাজয়।

সারারাত্রি একটা কথাই কেবল ঘোরাফেরা করতে লাগল মনের মধ্যে। ম'রে মানুষ যায় কোথায়? আমি মরে গেলে আমার কি সম্বন্ধ থাকবে সবার সংগে? জগতটা যদি যায় ম'রে? ভগবান আবার সৃষ্টি করবেন? ভগবানও যদি যান মরে?

কত বই পড়েছি, মনীষীদের কথা শুনেছি, দর্শনের অনুশীলন করেছি, কিন্তু শিশুসুলভ এ প্রশ্নগুলির জবাব মেলে নি আজও। যখনি ভাবি দর্শনের কোনো মূল প্রশ্ন সম্বন্ধে, সূক্ষ্ম যুক্তি বলে পরাস্ত করতে যাই অপরকে তখনই আমার স্মরণে বাজে কবিগুরুর রক্তিম অভিজ্ঞতাময় অন্তিম বাণী,—"প্রথম দিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে,—কে তুমি। মেলে নি উত্তর। বৎসর বৎসর চলে গেল। দিবসের শেষ সূর্য শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,—কে তুমি। পেল না উত্তর॥"

বার

পরদিন সকালে টমের অন্তিম কার্য সম্পন্ন করলাম। বড় খালি খালি লাগল মনটা। কোথায় যাই? মা কোথায় জানি নে। জানলেও, সেখানে 'হয়তো ভয়ে স্থান দেবে না আমাকে। খাব কিক'রে? চুরি-ডাকাতি, আত্মহত্যা!

চলো না সমীরদা, না খেয়ে আমি কতক্ষণ বসে থাকব তোমার জন্য! —বলতে বলতে কল্যাণ এসে জড়িয়ে ধরল আমাকে। আগের মতোই মিষ্টি কথা, মিষ্টি চাহনি, মিষ্টি ব্যবহার, সবল সুস্নিগ্ধ দাবি। কয়বছর কোনো সম্পর্ক ছিল না তার সংগে, কিন্তু তার সহজ সাবলীল কথায় মনে হ'ল যেন চিরকালই আমরা আছি একসংগে, কয়েকঘণ্টার ব্যবধান ঘটেছে মাত্র। আমার খাবারটা নিয়ে রোজই বসে থাকে, আজও আছে। বলল, স্নানের ঘাটে গেজেটমাসীমা বললেন তোমার কথা। ছাত্রের বাড়ী থেকে একটা ছুতো ক'রে আমার ঘরে এনে রেখেছি খাবারটা।

—তোমার ছাত্রের বাড়ী?

—ন্যাশনেল স্কুল উঠে গেছে। তার মধ্যে মজা ক'রে থাকি। এক বাড়ী ছাত্র পড়িয়ে খাই। হাইস্কুলে ক্লাশ-নাইনে পড়ি, ফার্স্ট বয় ব'লে মাইনে লাগে না। তুমি কোন্ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক দেবে, সমীরদা?

—নেব না। ইংরেজের উপাধি নেব না।

—নিতেই হবে তোমাকে। তোমার মতো মানুষ বড়লোক হয়ে দেশের নেতা না হলে চলবে না।

—বড়লোক হওয়ার পথেই মানুষ যায় খারাপ হয়ে।

—জান সমীরদা, সবাই ভুলে গেছেন স্বাধীনতার কথা, শুধু নিতাইদাই মনে রেখেছেন এখনও।

—মা কোথায় জান?

—কোন্ এক গ্রামে। বিপদের দিনে কেউ আসেনি। বড়দার এক শিক্ষক সাহস ক'রে স্থান দিয়েছিলেন মাসীমাকে। তাঁদের একটি খুব সুন্দর মেয়ে আছে, তুমি নাকি তাকে রক্ষা করেছিলে মরণ থেকে।

—আবার গাঁজার দোকানে পিকেটিং শুরু করেছ?

—কেন?

—কথার মধ্যে ধোঁয়ার মাহাত্ম্য দেখছি।

—তোমার লেখাপড়াটা হলে কিযে মজা হয়।

—পিসীমা কোথায়?

—নবদ্বীপে।

কল্যাণের ঘরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করলাম তার বর্তমান অবস্থার স্বরূপটি। ব্যথায় দুমড়ে উঠল বুকটা। ঘরের চালটা ফুটো, বেড়াটা ভাংগা। একটা ছেঁড়া মাদুর আর কাগজের একটা পুঁটুলি পড়ে আছে, বিছানার কাজ চলে তা দিয়ে। বই কিনতে পারে না, এর ওর তার বই এনে পড়ে। কবে চরকা কেটে তৈরি করিয়েছিল একটা কাপড় আর একটা চাদর, শীতের

মধ্যেও সেই তার একমাত্র সম্বল। সে শুশ্রূষা ক'রে বেড়ায় গ্রামের রুগীদের, তার নিজের অসুখে এক ফোঁটা জল গড়িয়ে দিতেও নেই কেউ। সকালে বিকালে জলখাবারের কথা পনের বছরের ছেলেটি ভুলেই গেছে। তবু নিজের খাবারটুকুর অংশ দিতে ডেকে এনেছে আমাকে।

শাকচচ্চরিটা দিয়ে বলল, বলতো কার রান্না? বিশ্বাস হয় না এত সাধারণ জিনিসের মধ্যে থাকতে পারে এমন অপূর্ব স্বাদ। বললাম, কার রান্না? সে বলল, গেজেটমাসীমার। নামমাত্র তেল মশলা দিয়ে কি অদ্ভুত জিনিস তৈরি করা যায় তা বোঝা যায় না পল্লীর দরিদ্র বিধবাদের রান্না না খেলে। আমার মনের কথাটা যেন বুঝতে পেরেই কল্যাণ বলল, গেজেটমাসীমার আজকাল রোজ খাওয়াও জোটে না। গ্রামের লোকেরাও তাঁকে দেখতে পারে না।

সারাদিন দুজনে একসংগে ঘুরে বেড়ালাম। ছাড়ি ছাড়ি ক'রেও কল্যাণ ছাড়তে পারে না আমাকে। আপনজনের স্নেহবঞ্চিত ছেলেটি কোনোক্রমে একটি বন্ধু পেলে আর ছাড়তে চায় না তাকে। রাত্রে সে ছাত্র পড়াতে গেলে আমিও চলে এলাম ঘরে। আজকের দিনটা তো কেটে গেল একরকম। তারপর? ঠিকমতো পড়লে আজ আমি বি-এ পড়তাম। এখন সবাই বোকা বলে আমায়।

—সমীর আছিস্? কেরসিন দীপ হাতে আনন্দঠাকুরাণী ঘরে প্রবেশ করলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। চুলগুলি তাঁর এলোথেলো, ঘাম ঝরছে কপাল বেয়ে।

—কোত্থেকে এলেন পিসীমা?

—সারাদিন খাতকদের বাড়ী ঘুরে ঘুরে আদায় ওয়াশিল করতে হ'ল। এই নে।

আমার হাতে তিনখানা দশটাকার নোট দিয়ে সস্নেহে বললেন, আশীর্বাদ করি, বাবা, পরীক্ষায় পাশ ক'রে গ্রামের মুখ উজ্জ্বল কর। সত্য যে হতে পারে স্বপ্নের চেয়েও বেশী অদ্ভুত তার প্রমাণ পেলাম আজ। বিমুগ্ধ হতবুদ্ধি হয়ে সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বললাম, আমি যে শোধ করতে পারব না, পিসীমা।

—একশ'বার পারবি। লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে পারবি।

—আপনি একটু বসুন।

—নাঃ বসার সময় নেই। সন্ধ্যা-পূজা কিছুই হয় নি।

—এক ফোঁটা জলও গ্রহণ করেন নি সারাদিনে? রাত্রি ক'রে কেন এলেন, কাল সকালে দিলেই তো পারতেন।

—ওমা, তুই বলিস্ কিরে! কাল সকালে যে তোকে রতনপুর যাত্রা করতে হবে পরীক্ষার ফীস্ দিতে!

—তাতে কি হয়েছে?

—শুভ কাজে যাত্রা করার সময় কি আমার মুখ দেখতে আছে রে, আমি যে বিধবা, আমি যে অপয়া!

—কাল সকালেই আপনাকে প্রণাম ক'রে আমি রতনপুর রওনা হব, পিসীমা। টাকাটা আপনি আজ নিয়ে যান।

—তোদের আজকালকার ছেলেদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা!

টাকাটা ফিরিয়ে দিলাম তাঁর হাতে। তিনি যাবার সময় আমায় কানের কাছে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললেন, দেখিস্ বাবা,

ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়ে যায়। লোকে আবার কি বলবে।

মনে পড়ল বড়দির বিয়ের সময়কার একটা ছোট্ট ঘটনা। বিয়েতে উপস্থিত থাকার জন্য মা বিধবাদেরও নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনরা প্রতিবাদ ক'রে বলেন অপয়া বিধবাগুলি বিয়েতে উপস্থিত থাকলে মেয়ের অকল্যাণ হবেই। প্রত্যুত্তরে মা বললেন, মানুষকে সম্মান দিলে যদি মেয়ে আমার বিধবা হয় তো হোক।

আমার কোনো অধিকার নেই একজনকে উপবাসী রেখে উপাধি অর্জন করার! মংগলের এই মূর্ত প্রতীককে ক্লেশ দেওয়া আরও পাপ! ইংরেজের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইংরেজের চেয়ে ভারতবাসীকে অকারণ নিকৃষ্ট মনে করানো। অন্তরের অভাবটা গোপন করার জন্যই মানুষ অর্জন করে বাহিরের উপাধি। বসুন্ধরাকে অধ্যয়ন ক'রে আমি অর্জন করব অন্তরের গুণরাশি। পূর্ণ করব মুক্তিপাগল বড়দার অগ্নিময় বাণী।

—সমীরদা।

—একি কল্যাণ, এত রাত্তিরে অন্ধকারের মধ্যে!

—কাল সকালে জরুরী কাজে বেরিয়ে যাব, ফিরে এসে যদি দেখা না পাই। তোমার কি কিছু ঠিক আছে। কেবলি ভয় হয় সব ছেড়ে ছুড়ে তুমি কোথাও চলে যাবে।

—কোথায় যাবে তুমি?

—এসেম্ব্লীর নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীর হয়ে কাজ করতে।

—কে দাঁড়িয়েছে?

—বিভুসেন।

—কোন্ বিভুসেন ?

—ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে গত বছর এসেম্ব্লীর মেম্বার হয়েছেন।

—অত্যাচারী বিভুসেন ?

—পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর আফিসে স্বদেশী কর্মীদের চাকরি দেন, নিজে দুবেলা সূতা কাটেন, খদ্দর ছাড়া পরেন না।

—তারই জন্য হারিয়েছি কত বন্ধুকে সেকথা খেয়াল আছে ?

—কন্‌ফারেন্সের সেক্রেটারী নিজেই এনেছিলেন তাঁকে।

—তোমার মন সায় দেবে এ কাজে ?

—ব্যক্তিগত খেয়ালে চললে, অতীতে কে কি করেছে সেসব ধ'রে বসে থাকলে তো কাজ করা যায় না আর। খাবারটা পাঠিয়েছিলাম, খেয়েছ ?

—আমার খিদে নেই, কল্যাণ।

—আমার ওখানে শোবে চল।

—থাক।

কল্যাণ চলে গেল। আমি হয়ে গেলাম সর্বহারা। সংসারের সবকিছু একদিকে সরিয়ে দিয়ে সারা প্রাণমন দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিলাম যাকে, মুহূর্তে সে ধুয়ে মুছে গেল আমার হৃদয় থেকে। সর্বস্ব পণ ক'রে সগৌরবে চলেছিলাম স্বাধীনতার আকাশ-প্রদীপ পানে। আকস্মিক ঝঞ্ঝায় নিভে গেল সে প্রদীপটি। থাকতে পারলাম না ঘরে। বেরিয়ে পড়লাম নিরুদ্দেশের পথে।

ধলেশ্বরীর তীর বেয়ে হাঁটতে লাগলাম পূবদিকে। আকাশের

বুক চিরে ছড়িয়ে পড়ল জোছনার ঝর্ণাধারা। আধো-আলো আধো-ছায়াতে ধরণী হয়ে উঠল কেমন রহস্যময়। নির্জন পৃথিবী, নিঃশব্দ আকাশ, সুষুপ্ত জীবনসমাজ, আমি শুধু একা! এতবড় বিশ্বসংসারটার মধ্যে কেউ নেই আমার! বাবা খুকু নেই। বড়দা পলাতক। মা নিরুদ্দেশ। দুঃসময়ে কোনো কাজেই এলাম না আমি, এ জীবনে আসবার কোনো আশাও নেই। আজীবন থাকব পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অভিশপ্ত! মাঝনদী থেকে মাঝি গেয়ে গেল—তুমি যখন ভাংগ নদী, ভাংগ একই ধার; মন যখন ভাংগে, ভাংগে দু'কূল তার। মনে পড়ল শিশুকালের কথা। সেদিনও বুঝতে পেরেছিলাম গানের অন্তর্নিহিত বেদনার সুরটি, কিন্তু সে বেদনা যে কত নিষ্করুণ তা উপলব্ধি করলাম এই প্রথম।

আশ্চর্য মানুষের মন। এই সামন্তপুর চমৎকৃত ক'রে দিয়েছিল সমস্ত বিশ্ববাসীকে সাহসের অতুল গরিমায়। সেদিনকার কথা। আজই সবাই ভুলে বসে আছে সেই গরিমাময় অভিযানের কেন্দ্রমণি আমার মাকে। যে বিভুসেন কশাঘাত করেছিল আমার মাকে, তারই জয়গান গাইছে আজ কল্যাণের মতো ছেলে।

কখনও হাঁটি, কখনও দাঁড় টানি, কখনও মোট বয়ে দু'এক পয়সা রোজগার করি। কোথায় যাব জানি নে। তবু আমি যাই। বড় মানুষ হব। কি ক'রে হব, কোথায় হব জানি নে। শুধু সমুখ পানে চলি। আহারে অনাহারে, বিশ্রামে অবিশ্রামে, নিদ্রায় অনিদ্রায় দিনের পর দিন আমি চলি।

সংসারে শুধু স্বার্থ। সমাজে শুধু অবিচার। আমি থাকব না পরিবারের পিঞ্জরে। বিশ্বসমাজের সকল মানুষের সুখ দুঃখ নিজের চোখে দেখে তাদের করে নেব আপনার জন। বিশ্বের সকল জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ ক'রে পরিপুষ্ট ক'রে তুলব আমার মনকে। ঝাঁপিয়ে পড়ব মহামানবের অন্তহীন নির্মম মুক্তিসাগরে। মুক্তসমাজে থাকবে না কেউ নির্ধন নিঃসহায় নিরবলম্বন, অবজ্ঞাত অবমানিত লাঞ্ছিত। থাকবে শুধু সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, সম্পদ-প্রাচুর্য। প্রাকৃতিক সম্পদ হবে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। ব্যবহৃত শ্রম ও সংযত জীবনযাত্রা হবে ব্যক্তি-সম্পত্তির মানদণ্ড। কিন্তু ব্রত উদ্‌যাপনের পথে আছে অগণিত বিঘ্নবিপদ, দুঃখ কষ্ট। আছে লজ্জা ভয়, নির্মমতা কৃতঘ্নতা। হৃদয়ের নিভৃতে কে যেন বলে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে,—

"শান্ত সন্ধ্যা, স্তব্ধ কোলাহল।
নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে
চলো ধীরে ঘরে ফিরে যাই॥"

না, না, না, নেবাব না আমার বিপুল বাসনাবহ্নি। ফিরব না আর ঘরে। আমি চলব, চলব, অনন্তকাল ধরে শুধু চলব। মুক্তির আনন্দ-আলোকে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলব বিশ্ববাসীকে।

সংসারব্যাপী সম্ভোগ-কোলাহলের অন্তরালে কার সে নিগূঢ় আমন্ত্রণে প্রাণটা আমার কেঁদে ওঠে আকুল হয়ে—"কোন্ বেদনায় বুঝি নারে হৃদয়ভরা অশ্রুভারে পরিয়ে দিতে চাই কাহারে আপন কণ্ঠহার।" সর্বপ্রাণ দিয়ে অনুক্ষণ কামনা করি

যে চিরবাঞ্ছিতকে, কোথায় আছে তার মধুময় শান্তিময় নিকেতন! নিঃস্ব রিক্ত পরিজন-পরিত্যক্ত হয়ে তবু আমি জীবনতরী বেয়ে চলি কার আকর্ষণে! কোথায় আমার সেই জীবননিধি! আমি চাই নে অর্থ, চাই নে মান, আমি চাই শুধু সে আলোটুকুর সন্ধান যার পরশ পেয়ে মুকুলিত হয়ে উঠবে আমার জীবনতরুর বৃন্তে বৃন্তে আনন্দের শতদল, ঝংকৃত হয়ে উঠবে আমার পরাণবীণার যত ঘুমন্ত গান! মহানগরীর জনসমুদ্র, অরণ্যের নিভৃত নিবাস, পর্বতের অনধিগম্য কন্দর, সাগরের নামহীন দ্বীপপুঞ্জ, ধনীর সুবিশাল অট্টালিকা, দরিদ্রের শতজীর্ণ পর্ণকুটীর, সন্ন্যাসীর সাধনাপূত আশ্রম, তস্করের পংকিল মন্ত্রণাগার সর্বত্র আমি খুঁজে বেড়াব আমার জীবনের পরশমণিকে। বিশ্বময় সকল তীর্থ ঘুরে ঘুরে বিন্দু বিন্দু ক'রে আহরণ করব বসুন্ধরার হৃদয়সঞ্চিত যত মণিকণাগুলি, বরণমালা দুলিয়ে দেব আমার জীবননিধির কণ্ঠতলে।

পৌঁছলাম এসে একটা ষ্টীমার-ষ্টেশনে। সহস্র সহস্র যাত্রী নামছে ষ্টীমার থেকে তীর্থস্নানোপলক্ষে। পাশেই বাজার। ভাল খাবার দেখে এগিয়ে গেলাম একটা দোকানের দিকে। কিন্তু ফিরে এলাম, পয়সা নেই। আর কত হাঁটব? কোথায় যাব? না খেয়ে ক'দিন বাঁচব?

পথিকদের সন্ত্রস্ত ক'রে আসছিল রুক্ষচুল জীর্ণবেশ এক উন্মাদ একটা মিষ্টি আলু কামড়াতে কামড়াতে। কখনও হাসছে অট্টহাসি হাঃ হাঃ হাঃ, কখনও গাইছে অনুযোগ-ভরা গান—বায়ু বহে উতরোল, বায়ু বহে উতরোল, হায় নারী

তুই কুল দিলি, মান দিলি, তোর নারী নামের রইল কি! আমি একটু সরে যাব পথ থেকে এমনসময় পাগলটা নিজেই আমার কাছে এসে অতি স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, তুই কে রে, শান্তু না? খিদেয় শুকিয়ে গেছে মুখটা, নে খা। ব'লেই আমাকে দিয়ে দিল তার অভুক্ত আত্মার শেষ সম্বল আলুটা। হাসতে হাসতে, গাইতে গাইতে আবার চলে গেল বাজারের ভিড়ের মধ্যে। কয়েকটা ছেলে চীৎকার ক'রে উঠল, জগা-পাগলা, জগা-পাগলা, মাথার উপর তেলের গামলা।

স্নেহস্নিগ্ধ ক্ষুব্ধহৃদয় কে এই উন্মাদ? ছোটবেলা খুব দুষ্টু ছিলাম ব'লে বড়দা তামাসা ক'রে আমায় ডাকতেন 'শান্তু', আমার সেই অজানা পুরানো নামটাই বা সে জানল কি করে? পাগলকে বিদ্রূপ করে সবাই, কিন্তু তার প্রেমার্ত করুণাকোমল আত্মার পাগল-করা ব্যথাটুকুর খবর রাখে কয়জন?

পাশের দোকানদারটি গ্রাহকদের কাছে বলল, বড় দুঃখের কথা। ওঁর নাম ছিল জগদীশচন্দ্র রায়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকতে ওঁর ছাত্রী ছিলেন সুলতা। বিয়ের পর দুজনেই আত্মনিয়োগ করেন স্বাধীনতার কাজে। অসহযোগ আন্দোলনে মন্দা পড়লে সুলতা স্বামীকে বললেন বেশী পয়সা রোজগার করতে। জগদীশ রাজী হলেন না। জগদীশের পরিচিত এক ধনী ব্যবসায়ী বিভুসেনের সংগে সুলতা নিজেই আরম্ভ করলেন শেয়ারের কাজ। জগদীশের পথ ছেড়ে দিয়ে রাজনৈতিক কাজও করতে লাগলেন বিভুসেনের সংগে!

সম্ভোগের কাছে আদর্শ হ'ল পরাজিত। অপমানে জগদীশ হয়ে গেলেন পাগল। জগদীশ রায়কে আজ আর চেনে না কেউ। সবাই তাকে ডাকে জগা-পাগলা। আশ্রয়হীন আত্মীয়হীন অনাহারে অনিদ্রায় রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে, আপন মনে হাসে আর গান গায়। পথে কিছু কুড়িয়ে পেলে খায়, নয়তো না খায়।

আমার পেট জ্বলে যাচ্ছিল খিদেয়। একটু আড়ালে গিয়ে জগদীশদার দেওয়া আলুটাই খেলাম। হ'ল না কিছুই। মেলাটাতে গেলাম, যদি কোনো ব্যবস্থা হয়। বিপুল জনসমুদ্র। লক্ষ লক্ষ নরনারীর বন্যাস্রোত। মাতৃহন্তা পরশুরাম এখানকার পুণ্যসলিলে অবগাহন ক'রে হয়েছিলেন শাপমুক্ত, তাই প্রতিবছর এমন দিনে দেশবিদেশ থেকে স্নানার্থীরা আসে শাপমুক্ত হতে। কত ধ্যান-ধারণা, কীর্তন-সাধনা। দোকান-পসার, আমোদ-প্রমোদ। ব্যাধি-সন্তাপ, বিঘ্ন-বিপর্যয়। সাধুর আশ্রম, সেবার প্রতিষ্ঠান।

রামকৃষ্ণসেবাশ্রমে গেলাম স্বেচ্ছাসেবক হতে। তাঁরা বললেন দরকার নেই। ভারতসেবাসংঘে গেলাম। আরও কয়েক জায়গায় গেলাম। তাঁরাও বললেন একই কথা। স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজ নিজ শিবিরে খেতে বসল সারি বেঁধে। সামান্য ডাল-ভাত।" আমার মনে হ'ল যেন অমৃত। একটি লোক এসে তরুণসংঘের কর্তাকে বলল, স্বামী চিন্ময়ানন্দ আরেকজন ভলান্টিয়ার চেয়েছেন। তিনি বললেন, এসব রোগে কোনো ভলান্টিয়ারই যে রাজী হয় না যেতে। আমি বললাম, যদি অনুমতি দেন, আমি যেতে পারি। চলে গেলাম লোকটির সংগে।

ছোটবেলা ডাব চুরি ক'রে রামপালে যাঁদের দিয়ে এসেছিলাম

তাঁদের বাসা। স্বামী চিন্ময়ানন্দ নামধারী নিতাইর কোলের কাছে শায়িতা মৃত্যুপথযাত্রিনী আমার মা। গৃহিণী, ছেলে, মেয়ে, অধীর, মেজদি সবাই কাঁদছেন অসহায়ভাবে। কেউ দেখল না আমাকে। শুধু মা অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন দেখে।

ডাক্তার এসে অক্ষমতা জানিয়ে বললেন, আমাদের শাস্ত্রে এসব রোগের ওষুধ বিশেষ কিছু নেই। ছেলেটি বলল, প্রেমতলা ঘাটে একজন ফকিরসাহেব বসন্তের টোটকা দেন। ডাক্তারবাবু বললেন, তুমি যাও সেখানে, আর পথে কংগ্রেস ক্যাম্পে বলে যেয়ো যেন দু'জন ভলান্টিয়ার ভোর হওয়ার আগেই পাঠিয়ে দেন। অর্থাৎ রাত্রির মধ্যেই মাকে আমরা হারাব। মেজদি অধীর কেমন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ব্যাকুল উতলা হয়ে উঠল বাসার লোকেরা। নিতাই একান্ত মনে হাওয়া করতে লাগল মায়ের মাথায়, একটু একটু জল দিতে লাগল মুখে।

কংগ্রেস থেকে ভলান্টিয়ার এসে পড়ল ফকির-সাহেবকে সঙ্গে ক'রে। আমি বাইরে চলে গেলাম। ছোটবেলা আমি ভাতের ফ্যান খুব ভালবাসতাম ব'লে মা বলতেন, ফ্যান খেলে মায়ের মরণ দেখতে পায় না। আমি বলতাম, বেশ ভাল হবে, তোমার অসুখ হলে আমি সর্বদা বসে থাকব তোমার কাছে তাহলে তুমি মরতে পাবে না কোনোদিন। কিন্তু সময়মতো পারলাম না নিঃসহায়ভাবে মায়ের শেষক্ষণটা দেখতে। এসে দাঁড়ালাম নির্জন নদীতীরে। পেছনে নিস্তব্ধ তীর্থমেলা, ঘুমন্ত যাত্রীর দল। সমুখে শান্ত নদীর জল, অরুণালো উদ্‌ভাসিত দিগদিগন্ত। এমনি প্রশান্ত গম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্তে প্রাচীন

ঋষিরা বেদমন্ত্রে আবাহন করতেন পরমপিতাকে। লাভ করতেন অসাধ্য সাধনের অলৌকিক শক্তি। যুক্তকরে আমিও বললাম, ভগবান, আমার মাকে বাঁচাও।

একবছর বয়স থেকে আমি মাকে ছেড়ে বড়দার সংগে ঘুমাতাম। বড় হওয়ার সংগে সংগে ভাল লাগত মায়ের কাছ থেকে পালিয়ে যেতে। তবু যেখানে যেতাম, মনে হ'ত একজন সবসময়েই ভাবছেন আমার মংগলের কথা। কি শান্তিময় নির্ভরস্থল সে নিভৃত ভাবনাটুকু! কিক'রে বাঁচব সেটুকু হারিয়ে? অন্যের ভাল'র জন্য নিজের ক্ষতি করলে সবাই যখন আমায় বলত বোকা, অন্তরাল থেকে মা তখন আমার দিকে চেয়ে থাকতেন আনন্দদীপ্ত চোখে। নিরাড়ম্বর গোপন সে চাহনিটুকুর আশ্বাসে আমি যে পারতাম অসাধ্য সাধন করতে। কিক'রে আমি বাঁচব সেটুকুহ ারিয়ে? কম্বুকণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল দৈববাণীর মতো,

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ॥

মাথার উপর কার করস্পর্শ অনুভব ক'রে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম প্রশস্তললাট, আয়তলোচন, উন্নতনাসিকা, শ্মশ্রুমণ্ডিত তেজোদ্দীপ্ত ফকিরসাহেব বলছেন, কাপুরুষতা শোভা পায় না তোমাকে, মনের দুর্বলতা ছেড়ে উঠে দাঁড়াও তুমি! বিমুগ্ধ বিস্মিত হয়ে আমি ডেকে উঠলাম, বড়দা! মুখে আংগুল দিয়ে নিষেধ ক'রে তিনি বললেন, বড়দা নয় নকড়ি-ফকির। পাশে এসে দাঁড়াল কল্যাণ। নিতাই এসে আমার হাত ধ'রে বলল, চল্, মাসীমা দেখতে চাইছেন তোকে।